পঞ্চ-সতী

রামায়ণ, মহাভারত, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অর্জ্জুন,
ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত,
শৈব্যা ও সীতা প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৩৩৫ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা।



পঞ্চসতী

সীতা

কৃষকের কুটীরে গৃহস্থের গৃহে ধনীর অট্টালিকায় এমন কি রাজাদের দরবারে পর্য্যন্ত, সমগ্র ভারতের ঘরে ঘরে, যখন মিথিলার রাজকন্যা সীতার রূপ-গুণের প্রশংসাবাদের তুফান বহিতেছিল, তখন যে সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী, মেয়েটীকে বিবাহ করিবার জন্য, ভারতবর্ষের ছোট বড় সকল ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজপুত্রগণ ক্ষেপিয়া উঠিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু মেয়ে একটিমাত্র অথচ পাত্র হাজার হাজার উপস্থিত ! রূপে-গুণে, কুলে শীলে, বলে বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে সম্পদে, যুদ্ধে পরাক্রমে কেহই কাহারও চেয়ে কম নহেন। সুতরাং মিথিলার রাজা জনকই বা কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে কন্যা দান করিবেন ? তাই, যে আগে যাইতে পারে সেই সীতাকে পাইবে, ভাবিয়া, রাজা ও রাজপুত্রগণ, সীতার কথা কানে যাইবামাত্র, অমনি সাজসোজ করিয়া লোক লস্কর লইয়া ধুমধামে মিথিলা রাজধানীর অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায় মনের সাধ কাহারই পূরিল না। ব্যাপার দেখিয়া, জনক রাজা এক বিষম পণ করিয়া বসিলেন। তাঁহার গৃহে বহুকাল হইতে শিবের এক ভীষণ ধনু রক্ষিত ছিল। যত বড় যোদ্ধা যত বড় শক্তিশালী যত বড় মহাবীর হউক না কেন, সেই ধনুকে গুণ দেওয়া দূরে থাকুক ধনুকটীকে তুলিতেও বড় কেউ পারিত না। জনক সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলেন—'যিনি আমার ঘরের এই হরধনুতে গুণ দিয়া ভাঙ্গিতে পারিবেন তাঁহার সঙ্গেই আমি সীতার বিবাহ দিব।"

মিথিলারাজ্যটী ছোটখাট হইলেও রাজা ছোট ছিলেন না। বিদ্যায়, জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রচর্চ্চায়, যোগযাগের অনুষ্ঠানে, মুনি-ঋষিগণের মত তপস্যায়, জনকের সমান রাজা আর দুটী ছিল না। সকল রাজারাই তাঁহাকে দেবতার মত ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। সুতরাং রাজর্ষি জনকের সেই পণের কথায় কেহ আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই সর্ব্বনেশে হরধনুটীর কথা সকলেই জানিতেন, তাই রাজর্ষির পণের কথায় মুখ শুকাইল অনেকেরই।

অনেকেই সেই সাংঘাতিক পণের কথা শুনিবামাত্র, অমনি ধূলোপায়েই, মুখখানি চুণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যাঁহাদের শরীরে বল বীর্য্য ছিল এবং বীর ও যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি ছিল, তাঁহারাই কেবল ধনুর্ভঙ্গের চেষ্টা না করিয়া ফিরিলেন না। কিন্তু হরি হরি,—ফল হইল একই সমান!

কেহ ধনুকটী তুলিতে গিয়াই পড়িয়া গেলেন, কেহ বা গুণ চড়াইবার চেষ্টায় নিজেই আহত হইলেন, আর অনেকেই তা নাড়িতেই পারিলেন না এমন কি, ত্রিভুবন বিজয়ী, দেশবিশ্রুত বীর, রাক্ষসরাজ দশানন পর্য্যন্ত সেই ধনুর্ভঙ্গের চেষ্টায় হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিয়া পলাইলেন। তখন আর কোন

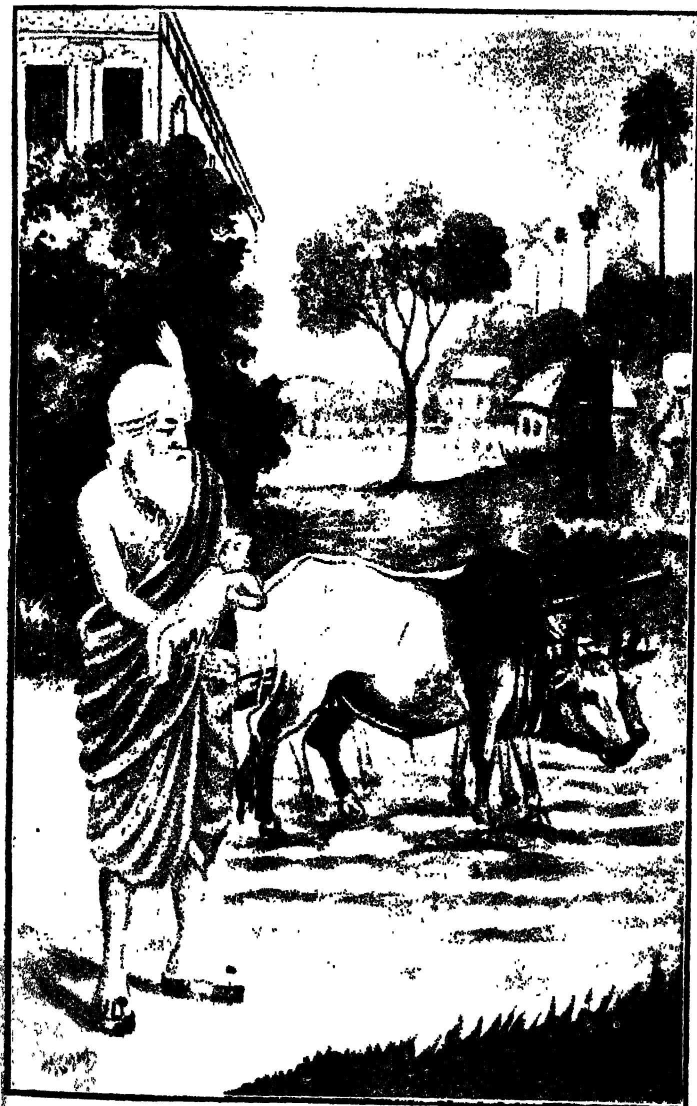
রাজা বা রাজপুত্র অগ্রসর হইতে ভরসা পাইলেন না। "রাজর্ষি জনকের পাছে তাঁহার পণ রক্ষিত না হয়? ঐকান্তিক চিত্তে ভগবানের কাছে সীতার উপযুক্ত পতির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তেমনি সময়ে সহসা একদিন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, ফুলের তনু দুটী কিশোরকে সঙ্গে লইয়া মিথিলার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন "রাজর্ষি শুনিলাম, তোমার কন্যার বিবাহে হরধনুভঙ্গের পণ করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজে তুমি হুলস্থুল লাগাইয়া দিয়াছ। তাই আমি এই কিশোর বীর দুটীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এটি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র, আর এটি তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মণ। ইঁহারা এই বয়সেই ভয়ঙ্করী তাড়কার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসগণকে ধ্বংস করিয়া আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছেন, ইঁহারা যে অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙ্গিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেবতার বরে মাটী হইতে যেমন সীতাকে পাইয়াছ, তেমনি দেবতার ইচ্ছাতেই এই শুভ সংঘটন উপস্থিত হইয়াছে জানিও। এক্ষণে কোথায় তোমার সেই ভুবন বিখ্যাত হরধনু আছে দেখাইয়া দাও।"

২

জনক রাজার সন্তান ছিল না। সন্তান পাইবার আশায় যজ্ঞ করিবার জন্য একদিন প্রভাতে উঠিয়া, লাঙ্গল দিয়া স্বহস্তে যজ্ঞভূমি চষিয়া সমান করিতেছিলেন। হঠাৎ লাঙ্গলের ফলায় একটা উঁচু জায়গা খুঁড়িবামাত্র এক অপরূপ আলোক প্রভায় সেই স্থানটা যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। তিনি চমকিয়া দেখিলেন মাটী হইতে লাঙ্গলের ফলায় একটী অপূর্ব্ব রূপবতী কন্যা উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি মেয়েটীকে বুকে তুলিয়া লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

আর যজ্ঞ করিবার আবশ্যক হইল না। রাজারাণী দুইজনেই পরম আনন্দিত মনে—অন্ধের নড়ির মত করিয়া—মেয়েটীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। লাঙ্গলের ফলক হইতে পাইয়াছেন বলিয়া, মেয়ের নাম রাখিলেন—সীতা।

সীতা যতই বড় হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার রূপজ্যোতি যেন রাজবাটী আলো করিয়া ফুটিতে লাগিল, তেমনি তাঁহার নানা সদগুণ রাশিতে তিনি রাজ্যশুদ্ধ লোকের মন হরণ করিয়া লইলেন। আর রাজারাণীর তো কথাই নাই, তাঁহারা সকল কাজকর্ম্ম, এমন কি, আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া মেয়েকে লইয়া মাতিয়া রহিলেন। সর্ব্বদা নানা প্রকার সুশিক্ষা দিয়া আদর্শ নারী গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ বপন করিলে যেমন প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সীতার উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রেও তেমনি রাজারাণীর শিক্ষা ও উপদেশের বীজ আশার অধিক ফল দানী করিল।



ক্রমে বাল্যকাল ছাড়াইয়া উঠিতেই তাঁহার অতুলনীয় রূপগুণের কথা সমগ্র ভারতের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইয়া রাজা ও রাজপুত্রগণকে আশায় মাতাইয়া তুলিল। সকলেই সীতাকে লাভ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।

সীতাকে পাইবার পরে রাজর্ষি জনকের 'উর্ম্মিলা' নামে একটী কন্যা এবং রাজর্ষির ভ্রাতা কুশধ্বজের 'মাণ্ডবী'ও 'শ্রুতকীর্ত্তি' নামে দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। কিন্তু সীতার মত যত্ন সমাদর কাহারও ছিলনা। তাহারা তিনজনেই সীতার সহচরী হইয়া দিবারাত্রি ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। জনক স্থির করিলেন সীতার সঙ্গে সঙ্গে ওই তিনটী মেয়েরও বিবাহ দিবেন। কিন্তু সীতার উপযুক্ত পাত্র যে কে—তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। এদিকে ভারতের নৃপতি সমাজ তো তাঁহাকে লাভ করিবার আশায় উন্মত্ত! তিনি কৌশল করিয়া—উপযুক্ত বীর ও সৎপাত্র পরীক্ষার জন্য —ওই ধনুর্ভঙ্গ পণ করিলেন।

কিন্তু তাহাতে হইল এই যে—এক চিন্তা গিয়া রাজর্ষির আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল। যদি এই শিবের ধনুটী কেউ ভাঙ্গিতে না পারে —তখন হইবে কি? এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে ও নিরাশায় যখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তেমনি দিনে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণকে আনিয়া তাঁহার মনে শান্তি ধারা বর্ষণ করিলেন।

শ্রীরাম লক্ষণকে দেখিবামাত্র শুধু রাজর্ষি জনক কেন, সভাশুদ্ধ সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন শ্রীরামচন্দ্র ধনুক ভাঙ্গিয়া সীতাকে লাভ করুন।"

ওদিকে—এতদিন ধরিয়া—এত রাজা ও রাজপুত্রের দল ধনুক ভাঙ্গিতে

আসিতেছিল, সীতার মন তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিবামাত্রই মনে হইল—ইনি যেন তাঁহার কত জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত নিতান্ত আপনার জন! সীতা ভাবের ঘোরে চক্ষু বুজিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—

"হে দয়াময়, হে ভক্তের ভগবান, শ্রীরামচন্দ্রের দেহে কোটী মত্তহস্তীর বল দাও। শুষ্ক তৃণের মত এই হরধনু যেন তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শ মাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! দাসীর এই ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ কর ঠাকুর!"

হইলও তাই! সর্ব্বসমক্ষে কিশোর বীর শ্রীরামচন্দ্র সেই দুর্জ্জয় হরধনু —তৃণের মতই—তুলিয়া, অবলীলাক্রমে গুণ দিয়া টানিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন দেশবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার সঙ্গে সঙ্গে রাজারাণীর আর আনন্দ রাখিবার জায়গা রহিল না। রাজর্ষি জনক—রাজা দশরথকে এবং তাঁহার অন্য দুই পুত্রকে আনিবার জন্য—তৎক্ষণাৎ আযোধ্যায় দূত পাঠাইয়া দিলেন।

সেই বিবরণ শুনিয়া দশরথ এবং তাঁহার রাণী তিনজনেরও আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা অবিলম্বে ভরত শত্রুঘ্ন, কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বহু লোকজন সহ মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া রাজর্ষি জনক, শ্রীরামচন্দ্রের করে সীতাকে, লক্ষ্মণের করে উর্ম্মিলাকে, ভরতের করে মাণ্ডবীকে এবং শত্রুঘ্নের করে শ্রুতকীর্ত্তিকে অর্পণ করিয়া ধন্য জ্ঞান করিলেন।

৩

কিন্তু, সেই হরধনু ভঙ্গের কথা শুনিয়া ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী মহাবীর পরশুরাম ক্রোধে জ্বলিয়া গিয়া, রাজা দশরথের অযোধ্যা যাইবার পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ দশরথ মনে মনে প্রমাদ গণিয়া অশেষ প্রকার স্তুতি মিনতিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাহা সহিতে পারিলেন না। বীর তাঁহারা—দুনিয়ার কাহাকেও দৃকপাত করিতেন না, তাঁহারা পরশুরামের সে স্পর্দ্ধা সহিতে পারিবেন কেন?

তখন দুই ভাইয়ের সঙ্গে পরশুরামের ঘোরতর বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল। পরশুরাম এই দুইটী নয়নাভিরাম, ফুলের গঠন, কিশোরের ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, বুঝিতে পারিলেন না—কে এই দুটী বালক তাঁহার মুখের উপর এমন ভাবে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেছে? অবশেষে, শ্রীরামচন্দ্রের শক্তির পরীক্ষা লইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন। রাজা দশরথ মহা সমারোহে পুত্র ও পুত্র-বধূগণকে লইয়া অযোধ্যা রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

কিছুদিন ধরিয়া অযোধ্যা রাজধানীতে যে সমারোহে এবং আমোদ প্রমোদের ঘটা চলিল তা বলিয়া আর শেষ করা যায় না। সেই সমারোহের ভিতরে সীতা—আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলেরই মন হরণ করিয়া, তাহাদের আরাধ্যা দেবীর মত হইয়া উঠিলেন। শুধু শ্বশুর শাশুড়ীরা কেন—দেশ শুদ্ধ প্রজামণ্ডলী—এমন কি, পশু-পাখীগুলি পর্য্যন্ত সীতার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল। সীতা সেই অসীম স্নেহ রাজ্যের ভিতরে আসিয়া

পড়িয়া—জনক জননীর স্নেহ পর্য্যন্ত বুঝি বিস্মৃত হইয়া গেলেন! নিজের ইচ্ছায় নিজের হাতে—সেই বিরাট পরিবারের—গৃহস্থালীর সকল ভার তুলিয়া লইয়া, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত সকলকে খাওয়াইয়া এবং জগদ্ধাত্রীর মত সকলের সেবা সুশ্রূষা ও প্রতিপালন করিয়া, আপনার অন্তরের স্নেহের ক্ষুধা মিটাইয়া লইতে লাগিলেন।

আর শ্রীরামচন্দ্র? তাঁহার তো কথাই নাই। সীতার অসীম গুণে তিনি মুগ্ধ! অসামান্য রূপে তিনি গৌরবান্বিত! দেশব্যাপী সুখ্যাতিতে তিনি আত্মহারা! সীতা—তাঁহার ধ্যান, সীতা তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার সারা-জীবন সীতাময় হইয়া উঠিল!

ওদিকে সীতারও তেমনি! তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল! যে কাজে যখন থাকুন না কেন—সর্ব্বত্র সকল সময়ে, সকল কার্য্যেই শ্রীরামচন্দ্রের মুখচ্ছবি দেখিতে পান! নিজের দেহ মন জীবন, এমন কি সারা সংসারের আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া দিবারাত্রি কেবলই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার চোখের উপরে ভাসিয়া থাকে। সীতা—শ্রীরামচন্দ্রময় হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথের আর সুখের সীমা নাই। তিনি মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রনা করিয়া—শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যভার দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। রাম-সীতা' সকলেরই জীবনের অধিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং সকলেই উৎসাহ ও আনন্দের সহিত রাজার কথায় সায় দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিষেকের দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য করিয়া ফেলিল।

আবার অযোধ্যা রাজধানী উৎসবের সজ্জা পরিল। ঘরে ঘরে অহোরাত্রি মঙ্গলশঙ্খ ও হুলুধ্বনি বাজিতে লাগিল। পথে পথে বৃক্ষ, লতা,

পুষ্প পতাকা ও মঙ্গল কলস স্থাপিত হইল। চারিদিক হইতে নিরন্তর বাদ্যধ্বনির সহিত উল্লাসের কলরব উঠিয়া—বায়ু প্রবাহে—দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

শুভদিনে অধিবাস হইয়া গেল। কৌশল্যা দেবী সীতাকে কাছে বসাইয়া—স্বহস্তে নানা আভরণে সাজাইয়া—রাজরাণীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ একা যেন একশো হইয়া—তোরণে দাঁড়াইয়া—উদয়াস্ত কেবল দরিদ্রগণকে অকাতরে ধন দান করিতে লাগিলেন। দেশ ব্যাপিয়া আনন্দের কোলাহল আকাশ কাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাত হইলেই শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক! দলে দলে প্রজারা দূর বহুদূর হইতে—আসিয়া রাজধানী ছাইয়া ফেলিল। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা মঙ্গল গান করিতে করিতে অন্তঃপুরে সীতার চারিদিকে গিয়া জড় হইতে লাগিল। চারিদিকেই কাতারে কাতারে লোক! চারিদিকেই উৎসাহ ও আনন্দের তুফান ছুটিতে লাগিল। সকলেই পরদিন প্রভাতের অপেক্ষায় উৎসুক হৃদয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

যথা সময়ে—পরদিনের সেই প্রভাতও আসিল, কিন্তু সারা দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা যে প্রত্যাশা বুকে লইয়া পল গণিতেছিল তাহাদের সে আশা মিটিল না। একটা সাংঘাতিক বজ্রাঘাতে যেন এক নিমেষের ভিতরেই সকলের হৃদয়-মন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অমাবস্যার কালি ঢালিয়া দিল।

৪

এক সময়ে রাজা দশরথ দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে বিষম আহত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মেঝ রাণী কৈকেয়ী প্রাণপাত সুশ্রূষায় তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিলে, তিনি রাণীকে দুইটী বর দিতে চাহেন। কৈকেয়ী উত্তর করিলেন—

"উপস্থিত এখন আমার কোন অভাবই নাই, ভবিষ্যতে যখন আবশ্যক হইবে তখন বর লইব। মহারাজ তখন বর দিতে যেন পিছাইবেন না।

রাজা দশরথও বলিলেন— "আমার এ প্রতিশ্রুতি চিরকাল স্মরণ থাকিবে, তুমি যখনই চাহিবে, তখনই আমি তেমাকে দুই বর দিব।"

বিবাহের পরে এই মেঝরাণী যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছিলেন সেই সময়েই তাঁহার পিত্রালয় হইতে 'মন্থরা' নামে এক কুব্জা দাসী সঙ্গে আসিয়া তাঁহার কাছেই বাস করিতেছিল।

এই মন্থরা দাসীর চেহারা যেমন কদাকার তাহার মনও ততোধিক নীচ ও কুৎসিৎ। সে কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকোৎসব ব্যাপার যখন প্রত্যক্ষ করিল তখন নিদারুণ হিংসায় তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি কৈকেয়ীর কাছে গিয়া সেই সংবাদ দিল। কৈকেয়ী পরম উল্লাসভরে তৎক্ষণাৎ নিজের গলার রত্নহার খুলিয়া তাহাকে দিয়া বলিলেন—

"আজ বড় শুভক্ষণে আমার রাত্রি পোহাইয়াছে মন্থরা, তোর মুখে বড় সুসংবাদ শুনিলাম। এখন এই পুরস্কার নে, কাল আমার শ্রীরাম যখন রাজা হইবেন আর সীতা-মা আমার রাণী হইয়া সিংহাসন আলো করিয়া

বসিবেন, তখন তোর পীঠের এই কুঁজটী পাকা সোনা দিয়া একেবারে মুড়িয়া দিব।"

কুঁজী রাগে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল, রত্ন-হার ছড়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া, ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জ্জিল—

"মর্—মর্—শীগ্‌গির গোল্লায় যাও, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আমাদের হিত করতে চাও? সতীন-পোর সুখে এত আহ্লাদ—গলায় দিতে-দড়ি জেটে না তোমার?"

কৈকেয়ী অবাক—স্তব্ধ! তখন কুঁজী অশেষ প্রকারে লাগাইয়া ভাঙ্গাইয়া—শ্রীরামচন্দ্র ও সীতার বিরুদ্ধে—তাঁহার মন বিষময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

জল পড়িতে পড়িতে পাথরও ক্ষয় হইয়া যায়—তা মানুষের মন তো কাচের মত ভঙ্গপ্রবন! ক্রমাগত বিষ ঢালিতে ঢালিতে—কৈকেয়ীর মনও তিক্ত—বিষময় হইয়া উঠিল। তখন কুঁজী পরামর্শ দিল—

"এই তোমার বর নেবার সময় এয়েছে, রাজা কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। এক বরে শ্রীরামকে চোদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাও অন্য বরে ভরতকে আমার রাজা কর।"

মন্থরার মন্ত্রনায় তখন কৈকেয়ীও সেই পণ করিয়া বসিলেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্রের অধিবাসের পরে রাজা দশরথ আপনি যখন সেই সংবাদ লইয়া মেঝরাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন, কৈকেয়ী নিজের সেই বিষময় পণের কথা জানাইয়া তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত করিতে ছাড়িলেন না।

রাজা দশরথের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী সহসা ঘুরিয়া যেন অতল অন্ধকার গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়া গেল। রাত্রিটুকু প্রভাত হইলেই শ্রীরাম

রাজা হইবেন—অধিবাস পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে কাতারে কাতারে, প্রজামণ্ডলী আসিয়া উৎসুকচিত্তে সেই শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতেছে, সমস্ত অযোধ্যা প্রদেশ অভিষেকোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে—একি সাংঘাতিক বজ্রাঘাত!

দশরথ মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কৈকেয়ীর ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, চোখের জলে নদী বহিতে লাগিল, তবুও—মন্থরার মন্ত্র ও শিষ্যা সাপিনী রাণীর—পাষাণ প্রাণে একটুও লাগিল না।

ক্রমে প্রভাত হইল, রাজসভা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, উৎসবের বাদ্যধ্বনিতে দশদিক কম্পিত হইল। কিন্তু তবুও রাজা সভায় আসিলেন না। এই অকারণ—অযথা বিলম্বের কারণ জানিবার জন্য বশিষ্ঠ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর মহলে উপস্থিত হইয়া—পিতার সেই অবস্থা দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, অশেষ প্রকারে মিনতি করিয়া বিমাতার কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈকেয়ী সকল কথা জানাইয়া শেষে বলিলেন—

"উপযুক্ত পুত্র তুমি, পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাঁহার এ দুর্দ্দশা মোচন কর।"

শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মাতাপিতার পদবন্দনা করিয়া কহিলেন—

"এই তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য এত কষ্ট পাইতেছেন কেন বাবা, আমি এখনই চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে চলিলাম। আমার জীবন ও জন্ম আজ সার্থক ও ধন্য হইল, আপনার ক্ষুদ্র কার্য্যও যে করিতে পারিলাম—ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, আপনি উঠুন আর অমন করিয়া





মনে কষ্ট পাইবেন না। মা, আপনি আমার বাবাকে বুঝাইয়া শান্ত করুন সুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করুন, আমি বিদায় হইলাম।"

শ্রীরামচন্দ্র সেখান হইতে বিদায় হইয়া কৌশল্যার কাছে গিয়া সেই বৃত্তান্ত কহিয়া বিদায় চাহিলেন। মুহূর্ত্তে যেন কঠোর বজ্রাঘাতে রাজপ্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। উৎসবের গণ্ডগোল ডুবাইয়া অন্তঃপুরের বুকফাটা রোদনরোলে আকাশ মেদিনী ছাইয়া ফেলিল। শ্রীরামচন্দ্র বহু কষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য পুরনারীগণকে বুঝাইয়া বিদায় হইয়া—সীতার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে চলিলেন।

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছুটে। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই সীতা সে সংবাদ পাইয়া পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন সে মুখে সরল আনন্দচ্ছটা ভিন্ন দুঃখ বিরক্তি, ক্রোধ বা ক্ষোভের অতি ক্ষীণ রেখাটি পর্য্যন্ত নাই। দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেলেন।

তারপর সীতা যখন মূল্যবান বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উৎসাহভরে কহিলেন—"আর কেন এখানে দেরী করিতেছ, চল এখনি আমরা যাত্রা করি, আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা ভাল নয়।"—

তখন শ্রীরামচন্দ্রের আপাদমস্তক একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধীভাবে সীতার মুখের পানে চাহিয়া গভীর বিস্ময়-ভরে বলিয়া উঠিলেন—

"সে কি, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে?"

"কেন—বনে! যেখানে তুমি যাইবে, ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে যাইব।"

সীতা এমনভাবে কথাগুলি বলিলেন যেন, বনে যাওয়া কিছুমাত্র

কঠোর বা গুরুতর ব্যাপার নহে! আনন্দ উপভোগ করিবার একটা নূতন পন্থা মাত্র। শ্রীরামচন্দ্রের চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সীতাকে বনবাসের দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সম্ভাবনা সকল বুঝাইতে লাগিলেন।

কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। শ্রীরাম বনবাসকে যতই ভীষণ করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, সীতা সহাস্য বদনে মধুমাখা কথায় তাহাকে আনন্দময় উপভোগের জিনিষের মত, সহজ সরল—চিত্তহারী প্রমাণ করিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ ধরিয়া বসিলেন। কিন্তু তবুও পতিকে সম্মত করিতে না পারিয়া শেষে কহিলেন—

"তোমার সঙ্গে বনবাসে যাপন করা আমার স্বর্গসুখ, আর তোমাকে ছাড়িয়া এখানে বাস করাই আমার বনবাস। যদি বিনা দোষে আমাকে এই বনবাসে ফেলিয়া যাও, তবে সত্যই আমাকে আর জীবিত পাইবে না।"

শ্রীরামচন্দ্র আর অমত করিতে পারিলেন না। সীতা পরম উৎসাহ ভরে নিজের সমস্ত বস্ত্র-অলঙ্কার পুরনারীগণকে বিলাইয়া দিয়া এক বস্ত্রে পতির সঙ্গে চলিলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও তাঁহার ধনুর্ব্বাণ মাত্র সম্বল লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সমস্ত অযোধ্যা প্রদেশ যেন ভূমিকম্পে কম্পিত হইতে লাগিল। দলে দলে প্রজাবৃন্দ—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক, বৃদ্ধ—ঘর দ্বার ফেলিয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলিল। সকলেই পুনঃপুনঃ শ্রীরাম ও সীতার নামে জয়-ধ্বনি তুলিয়া সমস্বরে কহিতে লাগিল—

"আমরা 'সীতা-রামের' প্রজা, যেখানে আমাদের রাজারাণী যাইবেন আমরা ও সেখানে যাইব, যে বনে তাঁহারা থাকিবেন—সেই বনে আমরা রাজধানী গড়িয়া তুলিব।"

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অশেষ প্রকারে বুঝাইয়াও তাহাদের একজনকেও ফিরাইতে পারিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া তাহাদের লইয়া চলিতে চলিতে সন্ধ্যাকালে এক অরণ্যের প্রান্তে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যা শূন্য পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। আর সেই বিরাট শূন্যতার ভিতরে "হা রাম-হা সীতা" বলিতে বলিতে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন।

৫

এদিকে ভরত ও শত্রুঘ্ন মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যের সেই অবস্থা দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন, তারপরে কৈকেয়ীর আচরণের কথা শুনিয়া, ঘৃণায়, মাতার মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করিতে চাহিলেন না। শত্রুঘ্ন তো মন্থরাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইতে ছুটিলেন, ভরত তাঁহাকে বহু কষ্টে থামাইলেন।

তারপর রাজা দশরথের মৃত শরীর তৈলে ডুবাইয়া রাখিয়া দুই ভাই শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য পুরনারীগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত চলিলেন। কিন্তু হায়, তাঁহাদিগকে সে অঞ্চলের কোথাও পাওয়া গেল না।

শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যখন কিছুতেই ভক্ত প্রজাগণকে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন দুইজনে গোপনে এক পরামর্শ আঁটিলেন। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, প্রজাগণ—যতক্ষণ পারিল—শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের চারিদিক বেষ্টন করিয়া জাগিয়া কাটাইল, শেষে একে একে তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। ক্রমে গভীর সুপ্তি আসিয়া সেই স্থানে বিরাজ করিতে লাগিল, রজনীর শেষ সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ নিঃশব্দে উঠিলেন এবং তেমনি নিঃশব্দে তাহাদিগকে ছাড়িয়া পলাইলেন। প্রভাত হইলে তিনজনে নানা পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে

চণ্ডাল-গুহক পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া সে রাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রভাতে গঙ্গা পার করিয়া দিল।

প্রজাগণ, প্রভাতে উঠিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অরণ্যের চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও আর তাঁহাদের চিহ্ন-মাত্র মিলিল না। অবশেষে তাহারা ব্যথিত চিত্তে হাহাকার করিতে করিতে শূন্যপ্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। ভরত তাহাদের মুখে কতক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া—শ্রীরামচন্দ্রের মনোভাব বুঝিয়া—সন্ধান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে সেই গুহক-চণ্ডালের কাছে গিয়াই উপস্থিত হইলেন। গুহক সকল বৃত্তান্তই শুনিয়াছিল, সুতরাং সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিয়া জ্বলিয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে শ্রীরামের শত্রু ভাবিয়া প্রথমে বিবিধ প্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা দিতেও কসুর করিল না। কিন্তু শেষে যখন বুঝিল যে তাহার সন্দেহ মিথ্যা, তখন গঙ্গা পার করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের গন্তব্য পথ বলিয়া দিল।

শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হইয়া নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ক্রমে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিলেন। লক্ষ্মণ কতকগুলি শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করিয়া একত্রে বাঁধিয়া ভেলা তৈয়ার করিলেন। সেই ভেলায় তিনজনে নদী পার হইয়া ক্রমে চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিত্রকূট রমণীয় স্থান, সেখানে অনেকগুলি মুনির আশ্রম ছিল। মুনি, মুনিপত্নী, মুনিবালক ও বালিকাগণ তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম সমাদরে আশ্রমে লইয়া গেলেন। সীতা বাল্যকাল হইতেই তপোবন বড় ভাল বাসিতেন, মুনিপত্নী ও কন্যাগণকে পাইলে সংসারের সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। এখানে তেমনি তপোবনবাসিনী তপস্বিনীগণকে পাইয়া

তাঁহার আর কোন অভাবই রহিল না। তাঁহারা দিনকতক আশ্রমে আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কাটাইলেন, তারপর সীতার ইচ্ছানুসারে লক্ষ্মণ সেই পবিত্র স্থানে কুটীর বাঁধিয়া দিলেন—তিনজনে সেই কুটীরে বাস করিয়া মনের শান্তিতে কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে ভরতও গঙ্গা পার হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে সকলের সহিত চিত্রকূটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে দশরথের মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ শাশুড়ীগণের সেই বিধবার বেশ দেখিয়া সীতা আর কিছুতেই মন বাঁধিতে পারিলেন না। কিন্তু এমনভাবে শোকে মগ্ন হইয়া থাকিলে গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়, তাই শ্রীরামচন্দ্র বহু কষ্টে মন বাঁধিয়া সীতাকে শান্ত করিলেন। তারপর সেইখানেই দশরথের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

ভরত কৈকেয়ীর দুর্ব্ব্যবহারের জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, অশেষ কাকুতি মিনতির সহিত, শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল অমাত্য ও অন্যান্য লোকজন আসিয়াছিল, সকলেই সকাতরে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সকলকেই মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন, এবং ভরতকে সত্বর অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরতের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"না দাদা, তা হইতে পারে না, রাজ্যভার জ্যেষ্ঠের, আপনিই অযোধ্যার রাজা, আমরা অনুজ—সিংহাসনের নীচে আপনার পদতলে আশ্রয়

পাইলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। যদি একান্তই আপনি ফিরিয়া না যান, তবে আপনার পাদুকা দিন, তাহাই সিংহাসনে বসাইয়া আমরা দু'ভাই প্রতিনিধি হইয়া আপনার নামেই রাজ্য রক্ষা করিব।"

ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া সকলের চক্ষু হইতেই আনন্দের ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র এমন ভাইকে কিছুতেই বিমুখ করিতে পারিলেন না, নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন। ভরত তাহাই মাথায় বহিয়া দলবল সহ শূন্যপ্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন এবং সিংহাসনের উপরে সেই পাদুকা স্থাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নামেই রাজ্য শাসন-পালন করিতে লাগিলেন।

ভরত প্রভৃতি বিদায় হইয়া গেলে, শ্রীরাম এবং সীতার মনও খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, আর চিত্রকূটে মন বসিল না, শীঘ্রই তাঁহারা সেস্থান ছাড়িয়া দণ্ডকারণ্যে চলিলেন।

সীতার জন্য মুনিপত্নী ও মুনি কন্যাগণের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, সীতার চক্ষুও শুষ্ক থাকিল না। অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া বলিলেন—

এই তুচ্ছ অলঙ্কারগুলি আমার আশীর্ব্বাদ ভাবিয়া পরিও, তোমার মত পতিব্রতাকে আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই। স্বামী দীন কি দরিদ্র, রাজা কি ভিক্ষুক, সচ্চরিত্র কি অসচ্চরিত্র, কঠোর কি কোমল— যেমনই হউন না কেন স্ত্রীর পক্ষে তিনিই সর্ব্বদেবতার শ্রেষ্ঠ, স্বামীকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখাই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য—আমার এই কথাটী সর্ব্বদাই জপমালা করিয়া রাখিও, তোমার আদর্শে জগৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

দণ্ডকারণ্য ভয়ানক স্থান। একে নানাবিধ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ

তার উপর—সেইস্থান লঙ্কার রাবণ রাজার অধিকারভুক্ত বলিয়া—রাক্ষসের উপদ্রবও কম ছিল না। কিন্তু সেই দণ্ডকারণ্যের ভিতরেও নানা স্থানে বিস্তর মুনিঋষিগণের তপোবন ছিল। মহাবীর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না, সুতরাং উৎসাহভরে সেই বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানকার মনিঋষিগণ—তাঁহাদিগকে পাইয়া—অমূল্য রত্নের মত পরম যত্ন ও সমাদরে লুকিয়া লইলেন। সেইখানে পঞ্চবটী নামক স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনজনে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু রাক্ষসদের উপদ্রবে এখানকার মুনিঋষিরা নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ করিতে পারিতেন না। শ্রীরাম লক্ষ্মণ রাক্ষসের ভয় দূর করিয়া তাঁহাদিগকে নিরুপদ্রব করিলেন।

একদিন রাবণের ভগ্নী সূর্পনখা রাক্ষসী পঞ্চবটীতে বেড়াইতে আসিয়া শ্রীরামের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং সীতাকে খাইয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সীতা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। শ্রীরাম কৌতুক দেখিবার ইচ্ছায় বিশেষ কিছু বলিলেন না। কিন্তু লক্ষ্মণের আর সহ্য হইল না, তিনি সূর্পনখার নাক কাণ কাটিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া রাক্ষস অনুচরগণকে সংবাদ দিল। তাহারা সদলবলে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু লক্ষ্মণের বাণে—ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মত—মুহূর্ত্তেই কোথায় যে উড়িয়া গেল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। সূর্পনখা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে লঙ্কায় গিয়া ভ্রাতা রাবণের কাছে সেই সংবাদ দিল। রাবণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মারীচ নামে এক অনুচরকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকবনের দিকে চলিল।

৬

এই মারীচ রাক্ষস মায়াবলে নানা রকম মূর্ত্তি ধরিতে পারিত। রাবণের আদেশে সে এক অপূর্ব্ব স্বর্ণ মৃগের রূপ ধরিল। তার পর—পঞ্চবটীতে—শ্রীরামের কুটীরের সম্মুখে দূরে দূরে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কুটীরে বসিয়া শ্রীরাম ও সীতা গল্প করিতেছিলেন, লক্ষ্মণ একটু দূরে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিলেন। হঠাৎ অদূরে সেই অপরূপ সোঁণার বরণ হরিণ দেখিয়া সীতা আহ্লাদভরে কহিলেন—

"বাঃ—বাঃ এমন সুন্দর হরিণ তো কখনও দেখি নাই। আমাকে ওই হরিণটি জীবিত ধরিয়া দাও—আমি উহাকে পুষিব।"

শ্রীরামচন্দ্র—সীতার মনে আনন্দ দিবার জন্য—লক্ষ্মণকে তাঁহার প্রহরায় রাখিয়া হরিণ ধরিতে ছুটিলেন, কিন্তু ধরা দূরের কথা, তিনি তাহার কাছেও যাইতে পারিলেন না। তিনি যত ছুটেন মায়ামৃগও ততই আগে আগে ছুটিয়া দূরে দূরে—আরও দূরে পলাইতে লাগিল। ক্রমে বহু দূরে গভীর বনের ভিতর লইয়া গেল। শ্রীরামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে কিছুতেই তাহাকে জীবিত ধরা যাইবে না। তখন বাণ ছুড়িলেন। সে অব্যর্থ বাণ মৃগের বুকে গিয়া বিঁধিল। অমনি মারীচ নিজের মূর্ত্তি ধরিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল এবং মরিতে মরিতে শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া চীৎকার করিল—

"ভাই লক্ষ্মণ শীঘ্র এস রাক্ষসের হাতে আমার প্রাণ যায়, শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর।"

সেই স্বর সীতার কানে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। শ্রীরামের বিপদ আশঙ্কা করিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে লক্ষ্মণকে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের কিন্তু সেই অদ্ভুত মৃগ দেখিয়া অবধি মনে মনে সন্দেহ হইয়াছিল, তিনি সীতাকে বুঝাইয়া বলিলেন—

"আপনি কিছুমাত্র ভয় পাইবেন না এ রাক্ষসী মায়া—রঘুপতির কণ্ঠস্বর নয়। অমন একটা কেন, হাজার হাজার রাক্ষস একত্রে আসিলেও শ্রীরামের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবেনা। আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে আপনার বিপদ ঘটিবে।"

কিন্তু "হা লক্ষ্মণ—হা সীতা" বলিয়া সেই কাতর কণ্ঠস্বর পুনঃপুনঃ আসিতেছিল। তাহা শুনিয়া—পতির অমঙ্গল আশঙ্কায়—সতীর বুদ্ধিভ্রম জন্মিল, তিনি পাগলিনীর মত হইয়া লক্ষ্মণকে যাইবার জন্য এমন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে লক্ষ্মণ আর কোন মতে বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তখন অগত্যাই তাঁহাকে যাইতে হইল। সীতা—বাণবিদ্ধ মৃগীর মত—ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুযোগ বুঝিয়া রাবণ—তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া—তাঁহার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। সীতা বহু মিনতি করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু দুষ্ট অপেক্ষা তো করিলই না, বরং ফিরিয়া যাইবার ভাণ দেখাইল। অতিথি ফিরিয়া যায় দেখিয়া সীতা বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন, দায়ে পড়িয়া ভিক্ষা দিবার জন্য কুটীরের বাহিরে আসিলেন। অমনি রাবণ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া বলে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া রথে তুলিল এবং অবিলম্বে লঙ্কার দিকে চলিল। সীতা আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে অঙ্গের সকল আভরণ খুলিয়া পথে ছড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সে হাহাকার ধ্বনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ শুনিতে পাইলেন না।

পঞ্চ সতী

এক পর্ব্বতের উপরে পক্ষীরাজ জটায়ু আহার অন্বেষণ করিতেছিল, সীতার রোদন কানে যাইবামাত্র, ব্যাপার বুঝিয়া, সে তৎক্ষণাৎ গিয়া রাবণের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার সঙ্গে রাবণের ভীষণ যুদ্ধ চলিল।

যুদ্ধে রাবণের রথ ভাঙ্গিল, মুকুট গেল, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। তখন রাবণ পাখীর পাখা কাটিয়া বলহীন করিয়া ফেলিল এবং—পাছে পথে আবার কোন বিপদ ঘটে সেই ভয়ে—অতিদ্রুত লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তারপর সীতার উপর পীড়নের একশেষ হইতে লাগিল। কত স্তুতি মিনতি, কত কান্নাকাটা, কত প্রলোভন, কত রকম ভয় দেখাইয়াও, রাবণ কিছুতেই সীতাকে বশীভূত করিতে পারিল না। তখন, বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি ভাবিয়া—এক বৎসরের সময় দিয়া তাঁহাকে লঙ্কার অশোকবনে বন্দী করিয়া রাখিল। সেখানে হাজার হাজার চেড়ীর দল দিবারাত্রি তাঁহার চারিদিকে বেড়িয়া—রাবণ রাজাকে ভজাইবার জন্য—পীড়ন করিতে লাগিল। সীতার পীড়ন ও লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল না। কিন্তু পতি-প্রাণা কিছুতেই টলিলেন না। অহোরহঃ রাম নাম জপ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে ও কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এমনি কিছুদিন কাটিবার পর একদিন হনুমান লঙ্কায় গিয়া—শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরী—নিদর্শন দেখাইয়া—তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিল। তারপর হনুমান সেইদিনেই পীঠে করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিলে, সীতা বলিলেন—

"বাবা আমি ইচ্ছায় কখনও পরপুরুষ স্পর্শ করি নাই, কেমন করিয়া তোমার পীঠে বসিয়া যাইব? তুমি প্রভুকে বলিও তিনি আসিয়া যেন সত্বর আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান।"

হনুমান বিদায় হইলে—কিছুদিন পরে অশোক বনে সীতার আর এক বন্ধু মিলিল। বিভীষণের পত্নী সরমা আসিয়া সীতার সিঁথিতে সিঁদূর দিয়া জানাইল যে শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

তারপর শ্রীরামের সঙ্গে রাবণের বহুদিন ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ চলিল। সে সময়ে সীতা বড়ই উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে সরমার মুখে শ্রীরামের জয়বার্ত্তা শুনিয়া কোনমতে আশায় বুক বাধিয়া রহিলেন।

অবশেষে একদিন তাঁহার আশা ফলবতী হইল। সবংশে রাবণের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তখন যেন তাঁহার দিন আর কাটিতে চাহিল না, প্রতি পল প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি যুগের মত বোধ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পতির চরণ দর্শন করিবেন সেই ভাবনায় সতী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তারপরে যখন একদিন সরমা তাঁহাকে বিচিত্র রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া শ্রীরামের নিকটে লইয়া চলিলেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে সীতা যেন বালিকার মত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া সরমার সঙ্গে যে কত কথা কহিতে লাগিলেন তাহার ঠিকানা রহিল না।

কিন্তু শ্রী র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে শ্রীরাম বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা আনন্দ প্রকাশ করিলেন না। সতীর হৃদয়

যেন বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তারপর যখন শুনিলেন যে তাঁহাকে অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করিয়া সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইবে তখন পরমানন্দে সম্মত হইলেন।

সাগরতীরে ধূধূ চিতানল জ্বলিল। বানর ও রাক্ষসেরা দলে দলে চারিদিকে বেড়িয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। সীতা অগ্নিদেবকে ও স্বর্গের দেবমণ্ডলীকে সাক্ষী করিয়া গর্ব্বভরে হাসিতে হাসিতে গিয়া সেই জ্বলন্ত অগ্নিরাশির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে তাঁহার অঙ্গস্পর্শে অগ্নিও যেন উত্তাপ ভুলিয়া শীতল হইয়া গেল—একগাছি কেশ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইল না, বরঞ্চ সীতার মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বলতর হইয়া ঝলমল করিতে লাগিল।

পরীক্ষা শেষ হইল, শ্রীরামচন্দ্র আনন্দে সীতাকে গ্রহণ করিলেন। তারপরে দলবল লইয়া পুষ্পক বিমানে চড়িয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। সীতা শ্রীরামের বামে বসিয়া গর্ব্ব ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া, চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

৭

চৌদ্দ বছরের পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। সারা অযোধ্যা প্রদেশ আবার মহোৎসবে মাতিল, সেই উৎসবের ভিতরে মহা সমারোহে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক হইয়া গেল। রাজারাণী বেশে শ্রীরাম ও সীতা অযোধ্যার সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন। পিছনে লক্ষ্মণ তাঁহাদের মাথার উপরে ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইলেন, দুই পাশে ভরত ও শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র কণ্ঠের 'জয় সীতারাম' রবে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু রাজরাণী হইয়াও সীতা গৃহস্থের ধর্ম্ম—নারীর কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। অভিষেকোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া লঙ্কার রাক্ষস দলের সহিত বিভীষণ এবং হনুমান জাম্ববান ও বানর সৈনিকগণকে লইয়া সুগ্রীব আসিয়াছিল। সীতা স্বহস্তে রাঁধিয়া সেই বিপুল বানর ও রক্ষবাহিনীর সকলকেই পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং সকলের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া, সকল দিকের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যশে মেদিনী পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তবুও হায় বিষম ভাগ্যলিপি—কুসুমে কীটের মত—তাঁহার এই বিমল সুখে ও আনন্দে কাল মেঘের ছায়াপাত করিতে ছাড়িল না। কোথাও কোথাও দুই একজন হীনপ্রকৃতি নরনারী তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কের আরোপ করিয়া কানাকানি সুরু করিল। সে কথা যখন শ্রীরামচন্দ্রের কানে গেল তখন তাঁহার বুকে যেন কালসাপ দংশন করিল। কিন্তু তিনি প্রজাপালনই করিয়াছিলেন জীবনের ব্রত! সুতরাং সীতাকে নির্ম্মলচরিত্র এবং নিরপরাধিনী জানিয়াও—শুধু প্রজারঞ্জনের

জন্য—গর্ভবতী অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন সে কথা শুনিয়া পাগলের মত অধীর হইয়া উঠিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুঝাইবার যত প্রকার উপায় ছিল সকল প্রকারেই প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তবুও শ্রীরামের সংকল্প নড়িল না। অবশেষে লক্ষ্মণের উপরেই সীতাকে—বাল্মিকীর তপোবনের নিকটে—পরিত্যাগ করিয়া আসিবার ভার পড়িল।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিলেন না, অতিকষ্টে মনোভাব গোপন রাখিয়া, সীতার কাছে গিয়া তপোবন দর্শনের কথা পাড়িলেন। গর্ভবতী সীতা—কয়দিন আগেই—শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তপোবন দর্শনে যাইবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের মুখে শ্রীরাম-চন্দ্রের অনুমতি পাইয়াই আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন এবং মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাগণের জন্য নানা উপহার লইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া রথে উঠিলেন; রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছেন জানিয়া শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিলম্ব করিতে পারিলেন না।

রথ ছাড়িল। হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু নাচিয়া উঠিল, মন যেন অবসাদভরে নুইয়া পড়িল, কিন্তু তপোবন দর্শনের প্রত্যাশায় শীঘ্রই তাহা বিস্মৃত হইলেন। তারপর বাল্মীকির তপোবনের কাছাকাছি আসিয়া রথ হইতে নামিয়া লক্ষ্মণের মুখে প্রথম যখন নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা শুনিলেন, তখন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়গুলি নিমেষে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গেল। তিনি শূন্যদৃষ্টিতে—জড় পুত্তলির মত—নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে দৃশ্যে লক্ষ্মণের মরণের অধিক যাতনা হইতে লাগিল, সীতার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

এতক্ষণে সীতার যেন সংজ্ঞা ফিরিল, দুটী চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারার মত, অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল, মর্ম্মান্তিক করুণস্বরে কহিলেন—

"তোমার দোষ কি, লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃবৎসল তুমি, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাপালন করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছ। আমার মত দুর্ভাগিনী রমণী পৃথিবীতে বুঝি আর দুটী জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি সকলেরই দুঃখ ও মনস্তাপের কারণ হইয়াছি—আমার মৃত্যুই মঙ্গল। এ জীবনে আর আকিঞ্চন নাই। কিন্তু আমার গর্ভে যে শ্রীরামের সন্তান রহিয়াছে, নহিলে তোমার সম্মুখে এখনি এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সকল সন্তাপ ঘুচাইতাম। আমি জানি শ্রীরামচন্দ্র কখনই স্বেচ্ছায় এ কাজ করেন নাই। জানিনা আমার বিচ্ছেদে এতক্ষণ তিনি কি করিতেছেন? সেই ভাবনা আমাকে আরও বেশী অস্থির করিতেছে। তুমি যাও লক্ষ্মণ, সর্ব্বদা ছায়ার মত সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিও, সর্ব্বদা তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিও, আমার মিনতি জানাইয়া বলিও শ্বশুর কুলের কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্য এ বনবাস অমার কাছে স্বর্গবাসের তুল্য প্রিয়, তিনি যেন আমার শোকে রাজধর্ম্ম না বিস্মৃত হন।"

বলিতে বলিতে অশ্রুভারে সীতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। লক্ষ্মণ আর দেখিতে পারিলেন না, পদধূলি মস্তকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইলেন। তখন সীতা যেন নিজের অসহায় অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝিলেন, আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদন রব শুনিয়া বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইল, পশুপক্ষীর চোখে অশ্রু বহিল, সমস্ত তপোবন বিষাদে মগ্ন হইল। মুনিবর বাল্মীকি তাহা শুনিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন।



পঞ্চ সতী

বাল্মীকির আশ্রমে সীতা ঐকান্তিক চিত্তে অহোরাত্রি শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহার দুইটী যমজ সন্তান হইল। তপোবনের সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—যেন দুই শিশুরাম সেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাল্মীকি তাহাদের জাতকর্ম্ম যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করিয়া নামকরণ করিলেন—লব ও কুশ।

লব কুশ রঘুবংশের বংশধর—ভাবী রাজ্যাধিকারী। সুতরাং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকি তাহাদের উপযুক্ত রূপ শস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সেই বয়সেই তাহারা অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিল। আর তাহার সঙ্গে বাল্মীকি শিখাইলেন—অপূর্ব্ব রামায়ণ গান! শিশুর কোমল মধুর কণ্ঠের সেই মধুবর্ষী রামায়ণ গান শুনিয়া তপোবনের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গটি অবধি মুগ্ধ তন্ময় হইয়া যাইত আর সীতা মুগ্ধ হৃদয়ে তাহা শুনিতে শুনিতে অবিরল অশ্রুপাত করিতেন। তেমনি সময়ে শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞের অশ্ব নানা স্থান ঘুরিয়া সেই তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাল্মীকি লবকুশের উপরে আশ্রম রক্ষার ভার দিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, শিশু দুটী আশ্রমের বাহিরে—কিছু দূরে—খেলিতেছিল। সহসা ঘোড়া সেইখানে আসিল।

ঘোড়ার কপালে বিজয়পতাকা আবদ্ধ, তাহাতে যে গর্ব্বিত বচন লিখিত ছিল তা' পড়িয়াই তারা রাগিয়া গেল, পরস্পর বলাবলি করিল—

"ভাই সীতারামের ছেলে আমরা—বাল্মীকির শিষ্য, মার নাম লইয়া ঘোড়া ধরিব, দেখি—কত বড় বীর কে আছে যে আমাদের হারাইয়া ঘোড়া লইয়া যায়?"

তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ধরিয়া লতায় বাঁধিয়া রাখিয়া দুই ভাইয়ে ধনুর্ব্বাণ লইয়া দাঁড়াইল।

সেইজন্য তাহাদের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে সৈন্যগণের কথা দূরে থাকুক, শত্রুঘ্ন, ভরত লক্ষ্মণ, এমন কি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়া অবসন্ন—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য একজন মাত্র সৈন্যও বাঁচিয়া রহিল না।

যুদ্ধ শেষে বাল্মীকি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যদ্বয়ের পরাক্রম দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় সসৈন্যে শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় চেতনা পাইলেন এবং শিশুদ্বয়ের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বাল্মিকী যজ্ঞের অশ্ব ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন—যজ্ঞসভায় সর্ব্বসমক্ষে শিশুদ্বয়ের পরিচয় পাইবেন।

সীতা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনিলেন তখন একসঙ্গে তাঁহার হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি জানিতেন যে সপত্নীক না হইলে যজ্ঞ-কার্য্য হয় না। ভাবিলেন শ্রীরামচন্দ্র বুঝি আবার বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু যখন জানিলেন যে তাঁহার ধারণা মিথ্যা, শ্রীরামচন্দ্র সীতার স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করাইয়া বামে লইয়া যজ্ঞ করিতেছেন, তখন তাঁহার গর্ব্ব ও আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। লবকুশকে কোলে লইয়া মুখ-চুম্বন করিতে করিতে আনন্দের অশ্রু-ধারায় অভিসিক্ত করিয়া দিলেন।

লবকুশ অবাক হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মাতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

৮

নৈমিষারণ্যে—গোমতী নদীর তীরে—শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানা দেশ-দেশান্তর হইতে রাজাগণ, ব্রাহ্মণগণ, মুনিঋষিগণ ও জনসাধারণ কাতারে কাতারে আসিয়া সেই বিরাট যজ্ঞক্ষেত্র ভরিয়া ফেলিল। বাল্মীকিও অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত লব কুশকে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

বাল্মীকির উপদেশ মত লব কুশ দুটী ছোট বীণা বাজাইয়া যজ্ঞক্ষেত্রের সর্বস্থানে মধুর কণ্ঠে 'রামায়ণ' গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যার কাণে সে গান পৌছিল সেই শুধু যে মুগ্ধ হৃদয়ে তন্ময় হইয়া গান শুনিল এমন নয়, শ্রীরামের সঙ্গে ছেলে দুটীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া এক দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে বলাবলি করিতে লাগিল—

"আহা দেখ দেখ—ঠিক যেন যুগল রাম!"

সেই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহাদের আহ্বান করিলেন। বনক্ষেত্রে একবার এই বালক দুটীকে দেখিয়া বুকে লইবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়াছিল, অনাহুত স্নেহের ভারে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। আবার তেমনি হইল। তার উপর তাহাদের মধুর কণ্ঠে স্বচরিত্র-গীত শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না—স্নেহভরে কোলে লইয়া বারম্বার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মুনির শিষ্য ভিন্ন লব কুশ অন্য পরিচয় জানিত না—বলিতেও পারিল না! কিন্তু বাল্মীকি আসিয়া যখন তাহাদের সত্য পরিচয় প্রদান করিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্রের বুকের ভিতরে যে কি তুফান বহিল, তা বলিতে পারা যায় না, তিনি সীতাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রজাগণের কথা মনে করিয়া বলিলেন—

"মুনিবর, আর আমি সীতাহারা হইয়া থাকিতে পারিতেছি না, প্র

দাসের প্রতি দয়া করুন—এই সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে সীতাকে আর একবার তাঁহার অপূর্ব্ব-সতীত্বের পরীক্ষা প্রদান করিতে আদেশ করুন, আমার মনস্তাপ ও রঘুকুলের অপবাদ মোচন করুন।"

বাল্মীকি সীতাকে যজ্ঞসভায় লইয়া গেলেন। সেই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিবার জন্য সে স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সেই—সাগর প্রবাহ সদৃশ—লোক-সমুদ্রের মাঝে, বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সীতা লজ্জা-বনত বদনে—সজল নয়নে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া শ্রীরামের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইলেন। বাল্মীকি কহিলেন "এই লউন মহারাজ আপনার নিরপরাধিনী, সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি নির্ব্বাসিতা সীতা। লোকাপবাদ ভয়ে আপনি বিনা বিচারে গর্ভবতী সাধ্বীকে আমার আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেইখানেই আপনার ওই দুটী যমজপুত্র—লবকুশ—জন্মিয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি—সীতার দেহ প্রাণ নিষ্পাপ—রামময় জীবন; এত উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনাতেও মা আমার কেবল আপনার নাম জপ ও মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া বাঁচিয়া আছেন। আপনি স্বচ্ছন্দে সীতাকে গ্রহণ করুন।"

বাল্মীকির কথার প্রত্যেক অক্ষরটি সমাগত জনবৃন্দের মর্ম্মস্থলে বিঁধিয়া সকলের চক্ষেই ধারা প্রবাহিত করিল। শ্রীরামের ইচ্ছা হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে সাধ্বীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করেন, কিন্তু হায়, লোক-রটনার ভয়ে পারিলেন না, সীতাকে আবার পরীক্ষা দানের জন্য অনুরোধ করিলেন।

সীতার আর সহিল না, তিনি করযোড়ে মর্ম্মান্তিক কাতরস্বরে পৃথিবীর পানে চাহিয়া বলিলেন—

"মা ধরিত্রি! শুনিয়াছি তোমার গর্ভে আমার জন্ম, আজ আকুল-প্রাণে ডাকিতেছি—আমায় কোলে স্থান দাও মা। আজ আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে—আমার বুকের ধন লবকুশ তাহাদের পিতৃঅঙ্কে স্থান পাইয়াছে, আর আমার অন্য আকিঞ্চন নাই। প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে—বাছাদের মুখ দেখিতে দেখিতে আজ মা আবার তোমার কোলে গিয়া জুড়াইতে চাই। আজ সভাজন আমার সতীত্বের সেই পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করুক। মা গো, যদি আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকি, যদি রাম নাম ভিন্ন অন্য নাম না জপিয়া থাকি, তবে মা বসুমতী, আমার সেই পুণ্যে তুমি এখনই বিদীর্ণ হও, আমি আবার তোমার গর্ভে প্রবেশ করি।"

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—সহসা—ভীষণ শব্দে বক্ষস্থল দুইভাগে বিদীর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দিব্যজ্যোতিতে সে স্থান আলোকিত করিয়া ধরিত্রীদেবী আবির্ভূতা হইয়া, দুই হাত বাড়াইয়া সীতাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পর মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের অন্তর্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে, আবার—যেমন সভাস্থল—তেমনি জোড়া লাগিয়া, সমভূমি হইয়া গেল।

পার্ব্বতী

১

পতিনিন্দা সহিতে না পারিয়া সতী দক্ষালয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। পর্ব্বত তনয়া বলিয়া হিমালয়ের বন্ধুগণ নামকরণ করিল—পার্ব্বতী। সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী তনয়ার জন্মে হিমালয়ের গৃহ প্রদীপ্ত রত্নরাজির উজ্জ্বল বিভা রাশিকেও ম্লান করিয়া অপূর্ব্ব ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হিমালয়বাসী গন্ধর্ব্ব কিন্নর এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদি পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য সম্পদে ভরিয়া উঠিল।

শিশু কুমারী যখন বাল্যসঙ্গিনীগণে পরিবৃতা হইয়া বালুকা ও মৃত্তিকায় খেলাচ্ছলে শিবপূজা করিতেন তখন দূর হইতে তাঁহাকে কনকলতা কিম্বা নব জলধরের বিদ্যুল্লতার মতই দেখাইত।

একদিন দেবর্ষি নারদ হিমালয় পরিভ্রমণে আসিয়া রাজ গৃহে ক্রীড়ারতা পার্ব্বতীকে দেখিলেন। মনে মনে অজস্র ভক্তি অর্ঘ্য দানে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হিমালয় রাজকে গিয়া বলিলেন—"তাঁহার এ কন্যা অসাধারণ, শিবের জন্যই ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং দেবাদিদেব মহাদেবের করেই যেন এ কন্যা অর্পণ করা হয়।"

কন্যা শিশু হইলেও দেবর্ষির বাক্যে রাজা রাণী সেই বয়স হইতেই কন্যাকে দেবাদিদেব মহাদেবের করে সম্প্রদানের মানসে, মনে মনে গৌরী দান করিয়া, মহাদেবের চরণোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন এবং শিবানী

সতীর যেরূপ যত্ন ও সমাদর হওয়া উচিত তেমনি যত্ন ও সমাদরে কন্যাকে প্রতিপালন করিতে ছিলেন।

কিন্তু প্রত্যাখ্যান ভয়ে রাজা হিমালয়প্রান্তে যোগাসীন মহাদেবের নিকটে তথনও এ বিবাহের প্রস্তাব করিতে সাহস করেন নাই তিনি অনুকূল ঘটনা প্রবাহের আশায় পথ চাহিয়া ছিলেন।

একটু বড় হইলেই রাজারাণী কন্যাকে সেই হিমালয়েরই একাংশে যোগাসীন যোগীবরের দর্শন, সেবা ও অর্চ্চণাদি করিতে যথন অনুমতি দিলেন—তথন আর পার্ব্বতীর হৃদয়ে আনন্দ ধরিলনা। তিনি আপন মনোমত আদেশ পাইয়া পরমানন্দে সহচরীগণে পরিবৃতা হইয়া—গিরীন্দ্রের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

২

দক্ষালয়ে সতীর দেহত্যাগের পর সতীদেহস্কন্ধে উদাসীন উন্মাদ মহাদেবকে বিশ্বকার্য্যে মনোযোগী করাইবার জন্য বিষ্ণু শীঘ্র চক্রদ্বারা সতী-দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও দেবতাদিগের মনোমত ফল লাভ হইলনা। চন্দ্রচূড় যখন দেখিলেন—যে তাঁহার স্কন্ধে আর সতী দেহ সংলগ্ন নাই—সতীর সহিত প্রকৃতই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে—তখন উদাসীন যোগীবর মহা বিরাগে হিমালয় প্রান্তে স্থাণুবনে গমন করিয়া মহাযোগে সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার সে ধ্যান আর কেহ ভঙ্গ করিতে পারিল না।

দেবতারা মিলিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। বিশ্বকার্য্যে শিব এরূপ উদাসীন থাকিলে—বিশ্ব সংসার ধ্বংশ হইবে। যাঁহার উপরে যে কার্য্য ভার অবস্থিত তিনি সে কার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলিবে কিরূপে? সুতরাং বিশ্বকার্য্যে শিবের মনোযোগ আকর্ষণ নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ প্রকৃতি পুরুষ পরস্পর বহুদিন এরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলে সংসারের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে। আরও দু একটি গুরুতর কারণ ছিল।

দেবতারা সকলে হিমালয়ে গিয়া সমাধিমগ্ন মহাদেবের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বিস্তর স্তব স্তুতি করিয়া আসিয়াছিলেন কোনও ফলোদয় হয় নাই।

তখন পরামর্শমত দেবরাজ ইন্দ্র মদনকে আহ্বান করিয়া শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

ফুলবান ত্রিভুবন বিজয়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান

করিতেন। দর্প ও আত্মম্ভরিতা তাঁহাকে এত উচ্চে তুলিয়াছিল যে দেবরাজের আদেশ শুনিয়া তিনি একটু উপেক্ষার হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ত্রিভুবন বিজয়ী—ব্রহ্মা বিষ্ণুরও ভয়ের কারণ। তিনি যে পিণাকপাণির ধ্যান ভঙ্গ করিবেন—ইহা আর বেশী কথা কি? তখন স্পর্দ্ধায় বুক ফুলাইয়া সখা বসন্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া, হরের ধ্যান ভঙ্গ করিতে চলিলেন। অতি দর্পেই সকলের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

সেই সময়ে পিতৃ আজ্ঞাতে অনুবর্ত্তিনী পার্ব্বতী সখিবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া তথায় নিত্য গিয়া বিবিধ বিধানে প্রাণঢালা যত্নে ভাবী পতির সেবা ও আরাধনা করিতেন।

অকাল বসন্তের সমাগমে হিমালয় হঠাৎ এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পদে পুলকিত হইয়া উঠিল। শীতে-জর্জ্জরিত বৃক্ষলতা এবং পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলেই নব-জীবনের সঞ্চারে পুলক-কম্পিত এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তপোবন তাহার সমস্ত নবীন ঐশ্বর্য্য-সম্পদে উদভ্রান্ত হইয়া মনের চঞ্চলতা সৃষ্টি করিতে লাগিল। সহসা এই অকাল-ঋতুর আবির্ভাবে, আতঙ্কিত নন্দী, অতি সাবধানে কঠোর প্রহরায় নিযুক্ত রহিল; এবং বামহস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী আপন ওষ্ঠাধরে রাখিয়া অনবরতঃ চপল প্রথমগণকে দমনে রাখিতেছিল।

৩

নন্দীর সম্মুখদিয়া প্রবেশ করিতে মদনের সাহসে কুলাইল না। তিনি অতি সাবধানে নন্দীর অগোচরে বৃক্ষলতাদির ব্যবধান পথ দিয়া, সেই ভীষণ স্থাণুর তপোবনে ধীরে ধীরে চোরের মত প্রবিষ্ট হইলেন।

বৃক্ষ-অন্তরাল হইতে সমাধিস্থ মহাযোগীবরের অচঞ্চল বিরাট বপুঃ দেখিয়া মদনদেব অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। চন্দ্রচূড়ের দেহ হইতে এমন একটা ভয়াবহ গম্ভীর মহাদ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যে আতঙ্কে শিহরিত মদনের—কম্পিত—শ্লথ মুষ্টি হইতে পুষ্প-ধনু খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। মদন মহাভয়ে নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে দেবদেবের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এক্ষণে উপায় কি? দেব সভায় তিনি হরেরধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য মহাদম্ভে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া কি প্রকারে তথায় গিয়া পুনরায় তিনি লজ্জা-ম্লান মুখ দেখাইবেন? এদিকে মহাযোগীবরের প্রতি চাহিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে সে ধ্যান ভঙ্গ করা তাঁহার মত শত শত ফুলবাণেরও সাধ্যাতীত।

সহসা তাঁহার এক পরম বাঞ্ছনীয় সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি সেই অবসরের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

সেই সময়ে সখিগণ-পরিবৃতা পার্ব্বতী, নব-বসন্তের ঝরাফুলে আপনার স্বর্ণবর্ণবপু খানি সজ্জিত করিয়া, একখানি—স্বপ্নদৃষ্ট—অপরূপ কনক প্রতিমার মত, দেবাদিদেবের পূজা ও সেবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বত-তনয়ার অলৌকিক রূপের প্রভা দর্শনে, মদন চমৎকৃত হইয়া

গেলেন। তাঁর বাম পদাঙ্গুষ্ঠের শোভা দর্শনে স্বয়ং রতিও বুঝিবা ঈর্ষ্যায় লাল হইয়া উঠিতেন।

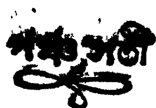
এমন সময়ে পার্ব্বতীর সমাগমে মদন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এখন তিনি নিশ্চিত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন বলিয়া মনে মনে দুরাশা জন্মিল, পুষ্পধনুতে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মোহন বাণ যোজনা করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতী মহাদেবের পাদমূলের সন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অর্ঘ্যদানে উদ্যোগিনী হইলে, অবসর বুঝিয়া, মন্মথ কুক্ষণে যোগীবরের প্রতি বাণ সন্ধান করিলেন।

সহসা যোগীবরের অন্তরে কথঞ্চিৎ ভাবান্তরের আবির্ভাব হইল, কিন্তু তিনি তদ্দণ্ডেই অমিত চিত্তবলে সে ভাব দমন করিয়া ইন্দ্রিয় নিপীড়িত করিয়া বসিলেন। তারপর কারণ জানিবার ইচ্ছায় চক্ষুরুন্মিলন করিলে দর্পী মদনের হাস্য প্রফুল্ল বদন মণ্ডল মহারুদ্রের দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি ঈষৎ বিরক্তি সহকারে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই শিবের ললাটস্থ নয়নের তীক্ষ্ণ বহ্নির লোলহান শিখায় সেই মুহূর্ত্তেই মদন ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।

মহাদেব তখন, যোগের অন্তরায় নারী-সান্নিধ্য পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আপনার সেবা, আরাধনা এবং অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের প্রভাব নষ্ট হইল দেখিয়া পার্ব্বতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং সখীগণ সম্মুখে বিফল মনোরথ প্রযুক্ত লাঞ্ছিত হইয়া তিনি মনে মনে নিতান্ত লজ্জিতা বোধ করিলেন। তখন অন্যপথে—তপশ্চর্য্যায় শিব-পতি লাভ করিবেন,



অথবা সেই চেষ্টাতেই জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, সংকল্প করিয়া, তিনি ক্ষুণ্ণ মনে, অবসন্ন হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতামাতার অনুমতি লইয়া তিনি শিবের তপস্যায় গমন করিবেন।

এদিকে পতিহারা রতি দারুণ শোকে মুহ্যমান হইয়া অনলে দেহ বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইলে, সহসা আকাশবাণী হইল। হরপার্ব্বতীর শুভবিবাহে মিলন হইলে করুণাময় মহেশ্বর মদনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিবেন। রতি সেই আশায় বুক বাঁধিয়া হরপার্ব্বতীর মিলনের শুভ দণ্ড প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৪

তপস্যা করিবার ইচ্ছায় পার্ব্বতী, পিতৃ অনুমতি লাভ করিলেও, মাতার সম্মতি গ্রহণান্তর, বিদায় লওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

অনেকগুলি পুত্রকন্যা সত্ত্বও পার্ব্বতী মেনকার নয়ন-পুত্তলি। আদরিণী দুহিতা উমা, স্নেহময়ী মাতার ধ্যান, জ্ঞান, ও জীবন-সর্ব্বস্ব স্বরূপিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি পলকে উমাকে হারাইয়া সংসার অন্ধকার দেখিতেন। উমা তাঁহার অন্ধের যষ্টি—নয়নের মণি—শোকের সান্ত্বনা—জীবনের অবলম্বন—সংসার-সমুদ্রের পথ-প্রদর্শক ধ্রুবতারা। সে উমাকে তিনি কেমন করিয়া কঠিন প্রাণে, তপস্যার অশেষ ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য বিদায় দিবেন? তাঁহারা কি মায়ের প্রাণ নহে?

তাঁহার গৃহ তো—সকল দেবতার পুণ্য আবাসস্থল। তিনি গৃহে থাকিয়াই সেই মনোমত দেবতার আরাধনা করুণ না কেন? এ নবীন বয়সে পঞ্চভূতের কঠোর উপদ্রব সকল সহ্য করিয়া, নিরাবরণে তপঃসাধনা তাঁহার দেহে সহিবে না। তাঁহার স্বর্ণকান্তি মলিন হইয়া যাইবে, অলৌকিক রূপ-লাবণ্য শুষ্ক হইয়া ঝরাফুলের মত ঝরিয়া পড়িবে। এ শিরীষ-কোমল তনু কঠোরতায় রুগ্ন হইয়া পড়িবে। মায়ের প্রাণে তনয়ার এ দুর্দ্দশা সহিবে না।

উমা বিধিমত উপায়ে মাতাকে বুঝাইতে যত্নবতী হইলেন। স্ত্রীলোকের রূপ, সৌন্দর্য্য, শ্রী, লাবণ্য, সমস্তই স্বামীর জন্য, নিজের কিছুই নাই —তাহার দেহ মন পর্য্যন্ত স্বামীর বস্তু; স্বামীর অধিকারে। শৈশবে

কন্যার উপর মাতার অধিকার থাকিলেও, যৌবনে সে অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। তখন কন্যার সমস্তই, এমনকি তাহার জীবন পর্য্যন্ত, স্বামীর বস্তু। সেই স্বামী বিমুখ হইলে—নারীজন্মই তাহার বিফল হয়।

সেই স্বামীর আরাধনার জন্য, সেই একমাত্র কাম্যদেবতা—স্বামীর মনস্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত, সেই নারীজনমের সর্ব্বস্ব-সার স্বামী লাভের চেষ্টাতে, সতীকন্যা পার্ব্বতী তপশ্চর্য্যায় গমন করিবেন। মিথ্যা মোহ-মায়ার বশে অভিভূত হইয়া, এমন পুণ্যকার্য্য হইতে কন্যাকে বিরত করা, সদা-শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতার কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর কার্য্যে, স্বামীর আরাধনায় —স্বামী অধিকৃত দেহের রূপ লাবণ্য নষ্ট হইলেই বা ক্ষতি কি? সে দেহ পতন হইলেও বা—শুভ ভিন্ন অশুভ কি? এমন মহা পূণ্য কার্য্য নারীর জীবনে আর কি আছে?

কন্যার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা আর তাহার উপর বিশেষ কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। তথাপি মায়ের প্রাণ বুঝিয়াও বুঝেনা, বুঝিতে চাহেনা। কন্যা যখন নিতান্তই স্থির প্রতিজ্ঞ, তখন তাহার ধর্ম্ম পথে মাতা হইয়া কেমন করিয়া বিঘ্ন ঘটাইবেন? তথাপি মেনকা পার্ব্বতীকে একা এই মহা কঠোর সাধনায় ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। কন্যার সহচরীগণকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

রুদ্যমানা জননীর শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতী সখিগণ সঙ্গে তপস্যারজন্য—হিমালয়স্থ গৌরীশৃঙ্গে গমন করিলেন।

৫

গৌরী শৃঙ্গ খুব ভয়াবহ স্থান না হইলেও বিশেষ মনোরম ছিল না। সেখানে স-সহচরী উমা, শিব-পতি লাভাশয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় মুণিমনোহারী বেশভূষা ছিলনা। তাঁহার স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্রের স্থানে বৃক্ষ বল্কল ও দেহের বর্ণ এবং রত্নালঙ্কারের পরিবর্ত্তে রুদ্রাক্ষের মালা সকল স্থান পাইয়াছিল। সুগন্ধি শীতল চন্দনের বিনিময়ে উমা তাঁহার স্বর্ণকান্তি ভস্মভূষিতা করিয়াছিলেন এবং আগুন রাশিকৃত চাঁচর চিকুররাজি বিন্যাসাভাবে রুক্ষ জটাভারে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। তাঁহার এই অপূর্ব্ব যৌবনে—যোগিনী বেশে এক আলৌকিক মহিমময়ী স্নিগ্ধ রূপ জ্যোতি বিনির্গত হইয়া গৌরী শৃঙ্গকে এক পূত আলায় উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

প্রতিদিন তপ জপ আরাধনা অন্তে, বিশ্রাম সময়ে পার্ব্বতী স্বহস্তে বৃক্ষ পুতিয়া তাহাদিগের মূল্যে জল সিঞ্চনে বর্দ্ধিত করিতেন এবং অঞ্জলি পূর্ণ বীজ সকল লইয়া প্রত্যহ মৃগ শশকাদি বন্য জন্তুগণকে আহার করাই-তেন। ক্রমে বন্য পশুপক্ষীগণ পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহ যত্নে এমন বশীভূত হইয়া পড়িল যে প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া পার্ব্বতীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ঘুরিত এবং তাঁহার সরল আয়ত লোচনে আপনাদের আয়ত লোচনের করুণ দৃষ্টি মিশাইয়া তাঁহার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। পার্ব্বতী স্বহস্তে তাহাদিগকে ভোজন না করাইলে আর তাহাদিগের ভোজনে তৃপ্তি হইত না। ভোজনান্তে পার্ব্বতীর চতুর্দ্দিকে তাহারা যখন মনের সুখে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত তখন তদবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিলে মনে হইত বুঝি বা প্রকৃতিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া এই নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে আপন শিশু গুলিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন।

রজনীযোগে পার্ব্বতী আপন বাহু উপাধানে শির বিন্যস্ত করিয়া অনাবৃত কঠিন পর্ব্বত তলে শয়ন করিতেন, কুসুম কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যার পরিবর্ত্তে সেই অনাচ্ছাদিত কঠিন শিলাতটই তাঁহার পরম উপাদেয় জ্ঞান হইত। এইরূপে কুসুম কোমলা পর্ব্বত তনয়া দুষ্কর তপে রত রহিলেন কিন্তু তথাপি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। শিব সাক্ষাৎকার ঘটিল না।

তখন পার্ব্বতী যোগীগণেরও দুঃসাধ্য—কঠোরতম—মহা তপস্যায় ব্রতী হইলেন।

তাঁহার কাঞ্চন কান্তি তপস্যার ক্লেশে খিন্ন করিয়া উমা গ্রীষ্মকালে আপনার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে প্রখর সূর্য্যের পানে চাহিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বর্ষায় প্রচণ্ড বাত্যা ও প্রখর বারি বর্ষণের মধ্যে অনাচ্ছাদিত শিলা খণ্ডের উপরে অনাবৃত দেহে অহোরাত্র উপবিষ্ট হইয়া—ঐকান্তিক চিত্তে তপো নিরতা থাকিতেন। এইরূপ—রজনীর পর রজনী কাটিয়া যাইত তথাপি তাঁহার তপ সাঙ্গ হইত না। দিকবালাগণ গগণ গবাক্ষ ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে প্রতি রজনীতে তাঁহার সুকঠোর ব্রত দর্শনে চমৎকৃত হইয়া যাইতেন।

দারুণ পৌষের শীতে তুষারকণবাহী শীতল বায়ুর হিল্লোলে, তুষার সমাচ্ছন্ন শীতল জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জমান থাকিয়া, পার্ব্বতী তাঁহার কঠোর তপঃসাধনা করিতেন। শীতের প্রকোপে সরসী বক্ষ সুশোভিনী কমলদল অদৃশ্য হইলেও, সরসী নীরে আকণ্ঠ নিমজ্জমানা পার্ব্বতীর ফুল্লারবিন্দ তুল্য বদন মণ্ডলকে সদ্য প্রস্ফুটিত কমল দলের ন্যায়ই দেখাইত।

এইরূপ অলৌকিক—অসাধারণ—দুষ্কর তপস্যায় কোমলাঙ্গী পার্ব্বতীকে নিরতা দেখিয়া অবশেষে মহাদেবেরও মন টলিল। তিনি তাঁহার মনের বল পরীক্ষার্থে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীবেশে গৌরীশৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বতীকে দর্শন দিলেন।

যথাবিহিত সম্মানে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দানে পূজা করিয়া পার্ব্বতী বসিবার আসন দিলে, সন্ন্যাসী তাঁহার এই কঠোরতম তপের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

লজ্জিত পার্ব্বতী পতি লাভের আশার কথা ব্যক্ত করিতে না পারিয়া সহচরী বৃন্দকে ইঙ্গিত করিলে, তাহারা সন্ন্যাসীর নিকটে সকল কথা ব্যক্ত করিল।

সন্ন্যাসী শুনিয়া পার্ব্বতীকে নানারূপে বুঝাইয়া বলিলেন—"তুমি সেই ভস্মমাখা ন্যাংটা শ্মশানচারী ভোলানাথকে কি গুণে প্রার্থনা কর? স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রাহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু, যমালয়ে অশেষ শক্তি সম্পন্ন ধর্ম্মরাজ রহিয়াছেন। তাহা ছাড়া নীল সাগরের তলে প্রবালের হর্ম্ম্যে—মুক্তার সিংহাসনে—মুক্তার রাজা জলদলপতি বরুণদেব রহিয়াছেন। জ্যোৎস্নার রাজ্যে অনাবিল রজত মেঘের সিংহাসনে বিমল কৌমুদির শুভ্রবাস পরিহিত চন্দ্রদেব রহিয়াছেন। সোনার আকাশে বর্ণ সিংহাসনে স্বর্ণবর্ণ দিকপ্রভাকারী সূর্য্যদেব রহিয়াছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে তোমার উপযুক্ত পরম সুন্দর শত শত দেবতা রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া এই দুর্লভ যৌবন ভার দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যায় খিন্ন করিতেছ কেন?

শ্মশানচারী ভস্মলেপিত কায় দিগম্বর—প্রেতপতি শিব—কি তোমার এই মহা সাধনার যোগ্য পাত্র?"

তখন পুচ্ছাবমৃষ্টা সাপিণীর ন্যায় পার্ব্বতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। শিব নিন্দাশ্রবণে তাঁহার লজ্জানম্র ভাব দূরীভূত হইল। ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি সন্ন্যাসীকে কহিলেন—

"সন্ন্যাসী তুমি আপন ক্রিয়া কলাপে ব্রতী থাক গিয়া। আমার সম্বন্ধে আলোচনায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই। কি আশ্চর্য্য, যোগী হইয়া আজিও তুমি যোগীরাজকে চিনিলেনা? ধিক্ তোমার সন্ন্যাসে। মহাদেবের মহিমা—তুমি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী—কি বুঝিবে? তিনি উলঙ্গ—হায় হায়, তিনি যে তুচ্ছ সূতা ও বল্কল বাস পরিত্যাগ করিয়া দশদিকে তাঁহার অম্বর রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যামশষ্প ও শস্য মণ্ডিত পৃথিবীতে লতাগুল্ম পত্র পল্লব বিজড়িত বনরাজিতে, ফলে ফুলে বিশোভিত বৃক্ষ শ্রেণীতে, পন্থাহারা পর্ব্বতে, সীমাহারা সাগরে, অন্তহারা আকাশে, বিরাট পুরুষ যে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাছে কি ছার বস্ত্র কি তুচ্ছ বেশভূষা? ভস্ম বিলেপিত কায়ে যে কত পবিত্রতা তাহার পরিমাণ 'তুমি কি করিবে' —একমাত্র ভস্মই জড়জগতের প্রকৃত পরিমাণ মহাত্যাগী শিব সর্ব্বস্ব পরকে বিলাইয়া দিয়া আপনি কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল সাজিয়াছেন? ত্যাগের আদর্শ এমন মহান জগতে আর কে আছে? তিনি শ্মশানচারী—মহাপুণ্য-ভূমি বাসী। শ্মশানের ন্যায় পুণ্যতীর্থ ত্রিজগতে যে আর কোথাও নাই —কিছু নাই। এই শ্মশানের আগুনে পুড়িয়াই যে পাপের কলঙ্ক ভস্ম হয়, আত্মারও বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এযে মহাকালের চিরানন্দ-নিকেতন! তুমি সন্ন্যাসী হইয়াও মঙ্গলময়—চির সত্য—চির ধ্রুব এমন শিবকে চিনিতে পারিলেন না?"

৬

পার্ব্বতী নিস্তব্ধ হইলেন। শিব-গুণানুবাদ কীর্ত্তনে তাঁহার অন্তর যেমন আনন্দ ও গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল তেমনি অভিমানে তাঁহার হৃদয়ও শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। তাঁহার গণ্ডস্থল আরক্তিম ও দেহ ঋজু হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হইতেছিল।

ছদ্মবেশী মহাদেব পার্ব্বতীর শিবানুরাগ দর্শনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি এক দৃষ্টে নির্ণিমেষ লোচনে ক্ষণেক গৌরীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে পুনরায় কি বলিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে পার্ব্বতী বলিয়া উঠিলেন—

"সখি ব্রহ্মচারীর ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতেছে, উনি বোধহয় আরও কি বলিবেন। কিন্তু উঁহাকে নিষেধকর। এ স্থান শিবনিন্দার নহে—শিব আরাধনার। যে ব্যক্তি মহতের নিন্দাবাদ করে সে যেমন মহা পাপী যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করে তাহারও তদ্রূপ মহাপাতক সঞ্চার হইয়া থাকে। উনি অতিথি উনি এ বিষয়ে স্থির না হইলে আমিই স্থানান্তরে গমন করিব।"

পার্ব্বতী প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। সন্ন্যাসীর দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না। তখন মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হইয়াছিল। তিনি তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপে প্রকটিত হইয়া পার্ব্বতীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা চির বাঞ্ছনীয় নিধি সম্মুখে পাইয়া পার্ব্বতী জ্ঞানহারা প্রায় হইয়া পড়িলেন। মহাদেবকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া তিনি ত্রাস্ত ভীত ও

সঙ্কুচিত হইলেন। মহা লজ্জায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। তিনি তথা হইতে অপসারিতা হইবেন কি দাঁড়াইয়া থাকিবেন বুঝিতে পারিলেন না। একান্তে নতমুখে আপনার নথ খুঁটিতে লাগিলেন।

বহুসমাদরে মহাদেব তাঁহার হস্তধারণ করিলেন, তখন ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া পার্ব্বতী কহিলেন—"পিতা কর্ত্তৃক যথা শাস্ত্র সমর্পিত হইলে তিনি পরম সুখী হইবেন।"

পার্ব্বতীর ইঙ্গিত বুঝিয়া তাঁহাকে আশা দিয়া মহাদেব সেই চেষ্টায় গমন করিলে, সহচরী বৃন্দ পরিবৃতা পার্ব্বতী পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল আর তপস্যার প্রয়োজন ছিলনা।



মদন-ভস্ম

নারদকে আহ্বান করিয়া মহাদেব হিমালয়ে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি গিয়া রাজাকে সম্মত করিয়া মহাদেবের করে পার্ব্বতী সম্প্রদানের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিবেন। নারদ ত তাহাই চান, পূর্ব্ব হইতেই হিমালয়কে বলিয়া উমাকে শিবের চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে শিবের আদেশ পাইয়া মহানন্দে মুনিবর বীণা বাদন করিতে করিতে হিমালয় পুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে দিনক্ষণ দেখিয়া বিবাহের পাকাপাকী করিয়া আসিলেন। এ সংবাদে শিব মহা হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। কৈলাসে প্রেতগণের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল।

সর্ব্ব দেবতারা মিলিয়া শিব-বিবাহের ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত ও যোগাড় যন্ত্র করিতে লাগিয়া গেলেন। শিবের বিবাহ—প্রকৃতি পুরুষের মহামিলন! সেই মিলনের উপর তাবৎ বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছিল। সুতরাং সকলেই অতি আনন্দে ও অত্যন্ত যত্ন ও সন্তর্পণে এ কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

বিবাহ দিবসে ভোলানাথ বর সাজিয়া শুভক্ষণে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অঙ্গের বিভূতি চন্দনের সুরভি বিকীর্ণ করিতে লাগিল, হাড়মাল মুক্তামালায় পরিণত হইল, রুদ্রাক্ষে রত্নভূষণও মলিনত্ব প্রাপ্ত হইল। জটাকলাপে চাঁচর চিকুরদাম পরাজিত হইয়া ললাটের বাল শশির ভাতিতে অপূর্ব্ব মণিমুকুটের প্রভা উদ্ভাবিত হইয়া উঠিল। কর্ণের ধুস্তুর কুসুম রত্ন-মণ্ডিত কুণ্ডলকেও হতশ্রী করিয়া দিল। বুঝি ম্লান হইয়া সে চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

পঞ্চ সতী

বৃষভোপরি বরবেশী শঙ্করের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দেবতাগণ আপনাপন বাহনের উপরে বরযাত্র চলিলেন। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ মঙ্গল গীতবাদ্যে আকাশ প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিল। সর্ব্বশেষে আনন্দোন্মত্ত প্রমথগণ তাণ্ডবনৃত্যে দশদিক কম্পিত করিয়া চলিল।

বর হিমালয় ভবনে উপস্থিত হইলে মঙ্গল বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল এবং পুরাঙ্গনারা বর দেখিতে ছুটিল। তাহাদের প্রাণসমা গৌরীর বর আসিতেছে—তাহারা কি না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে? যে যে ভাবে যে কর্ম্মে ছিল, সে সেইভাবেই সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল।

কোন সুন্দরী বেণী রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই অদ্ধসমাপ্ত বেণী হাতে লইয়াই ছুটিলেন। কেহ চরণে অলক্তক রাগ মাখাইতে ছিলেন;—এক পদ সমাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পদের অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছিল। তিনি সেইভাবেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, জলনিষিক্ত তরল অলক্তক পায়ের উপর পড়িয়া গিয়া সমস্ত রক্তাক্ত হইয়া গেল—তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেহ পুত্রকে আদর করিতেছিলেন, তিনি তাহাকে কোল হইতে ফেলিয়াই ধাবিত হইলেন—পুত্র কাঁদিয়া বাড়ী মাতাইতে লাগিল—মাতা লক্ষ্য করিলেন না। কেহ তাম্বুল রচনায় নিযুক্ত ছিলেন;—বর আসিয়াছে শুনিয়া অন্যমনস্কে তাম্বুলের পরিবর্ত্তে খানিকটা চুণ মুখে ফেলিয়াই চলিলেন। কেহবা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার কটিবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, সেই শিথিল কটিতটে বস্ত্র বাঁধিতে বাঁধিতেই তিনি ছুটিলেন। কিন্তু অন্যমনস্কে এমন ভাবে কটিবন্ধন করিলেন যে তাঁহার লজ্জা সম্বরণ দূরে থাকুক, যে দেখিল সেই লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল,

কিন্তু বর দর্শনাভিলাষিনী সুন্দরীর সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর মাত্র ছিল না।

নির্ণিত শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে, হিমালয়-রাজ সুবেশা, সালঙ্কৃতা কন্যাকে শিবের করে সম্প্রদান করিলেন। প্রকৃতি-পুরুষের মহামিলনে সেইক্ষণে এক অভূতপূর্ব্ব পরম পুলক সঞ্চারিত হইয়া ত্রিজগত ব্যস্ত করিল। সহসা মানবের মনে আপনা হইতেই সে আনন্দের ধারা উপলব্ধি হইতে লাগিল।

বরকন্যা বিদায়কালে মেনকার উদ্বেলিত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী রোদন-রোলে সমস্ত হিমালয় অবসন্ন হইয়া পড়িল, পশু পক্ষীও নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। পার্ব্বতীর বিকচ কমল নয়নদ্বয়ে বরষার প্রস্রবণ ছুটিল। নির্লিপ্ত নির্গুণ মহাযোগী ত্র্যম্বকের নয়নও শুষ্ক ছিল না।

'হর-পার্ব্বতী' কৈলাশে আসিলে, বহুদিন পরে কৈলাস শিখর আবার যেন নব-জীবনে জাগরিত হইয়া উঠিল। শ্যামাঙ্গী নব কিশলয় বিকশিতা লতার বেষ্টনে বন্য তরুরাজি শ্যাম শোভা-সম্পদে গৌরবান্বিত হইল, ফলে ফুলে বৃক্ষশির অবনত হইয়া মৃদুপবন হিল্লোলে দুলিতে লাগিল, সুকোমল নব শ্যাম শষ্যে পর্ব্বত গাত্রে প্রকৃতি যেন লীলা-ভবনের কোমল আস্তরণ বিছাইয়া ছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে—শাখায় শাখায়—বিচিত্র-বর্ণ-বহুল-বিহঙ্গম দল আপনাদের আনন্দ তানে কানন মুখরিত করিয়া তুলিল।

হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া, পরস্পর বিরোধী ভাবাপন্ন বন্য পশু সকল, মনের আনন্দে পরস্পরের গা চাটিতে লাগিল। গো—ব্যাঘ্রে, সিংহ—হরিণে, ময়ূর—ভুজঙ্গে, বিড়াল—মূষিকে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া মনের সুখে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে লাগিল।

কৈলাশ-শিখর বাহিনী গঙ্গা মধুর কলতানে প্রেম-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে, উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ধীরে প্রবাহিত হইল। সে তানে পাখী গাহিল, কুসুম ফুটিল, মলয় বহিল, সুরভি ছড়াইল। বন্য পশুকুল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শিব-শক্তির মিলনে, বিশ্বের প্রাণে প্রাণে এক মহা প্রেমসঙ্গীত ছুটিল। নবীন প্রেমের বলে শিথিল বিশ্বের মর্ম্মগ্রন্থী দৃঢ়-বদ্ধ হইল।

গগনমণ্ডল স্বচ্ছ নীলাভা ধারণ করিল। সূর্য্য কণকরশ্মি ছড়াইল, চন্দ্র স্নিগ্ধসিত কিরণজালে জগতের পরিতপ্ত প্রাণে ফুল্ল হাসি মাখাইয়া

দিল। শত শত নক্ষত্রপুঞ্জ মৃদু কিরণ ঢালিতে লাগিল, গ্রহগণ নিজ নিজ আবর্ত্তে প্রেমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আকাশে দেবতাগণ অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিল। দিকবালাগণ গগন-গবাক্ষ খুলিয়া মুগ্ধ-নেত্রে এই মহা-মিলন দর্শনে বিমোহিত হইয়া রহিলেন।

দুঃখ, শোক, তাপ, হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ দূরে পলাইল। কৈলাশশিখর পূর্ণ প্রেমানন্দের শান্তি-আশ্রমে পরিণত হইয়া গেল। নন্দী আনন্দে সিদ্ধি ঘুঁটিতে লাগিল, প্রমথগণ মত্ত প্রাণে করতালি দিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বহুকাল পরে আবার কৈলাশের শান্তি ও আনন্দের হিল্লোলে ব্রহ্মলোক এবং বৈকুণ্ঠপুরীও যেন ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। দেবাদিদেব আবার বিশ্বকার্য্য ভুলিয়া পার্ব্বতীর মহাপ্রেম সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

একবার সতীহারা হইয়া এই আনন্দধাম, এই শান্তি নিকেতন অন্ধকার ও অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। ভোলানাথ সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্মশানে মশানে, কাননে—কান্তারে উন্মাদ বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবার যদি সতী ফাঁকি দেন? আবার যদি দু'কথায় ভাঙ্গড়কে ভুলাইয়া চলিয়া যান? এবার শঙ্কর পার্ব্বতীকে দিবারাত্রি চক্ষে চক্ষে রাখিলেন, অহর্নিশি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার জপ তপ গেল, শ্মশান ভ্রমণ গেল, ভিক্ষা করা ঘুচিল। ভোলানাথ সর্ব্বস্ব ভুলিয়া পার্ব্বতীতে মগ্ন হইলেন, শিব—শক্তিতে লীন হইলেন। চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির আশ্রয়ে থাকিয়াও—শিব চৈতন্য হারাইলেন।

তখন তাঁহাকে আবার জাগাইবার প্রয়োজন হইল। আদ্যাশক্তি বিশ্বের মঙ্গলে—বিশ্ব-হৃদয়ে আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিলাষ

করিলেন। আদ্যাশক্তি বিশ্বের মূলাধার হইলেও—শিব বিহনে শক্তিহীনা, এবং বিশ্বের বিশ্ব-বীজাত্ম হইলেও, শক্তি বিহনে নির্জ্জীব, জড়। শক্তি শিব ছাড়া নহেন, শিবও শক্তি ছাড়া নহেন। এই পূর্ণ মহা মিলনই সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল। এই মহা রহস্য জগতে প্রচারিত করিবার আয়োজন হইল।

তখন লীলাময়ী মহাশক্তি এক স্বপ্নাতীত অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ করিলেন।

৯

সর্ব্বস্ব ভুলিয়া ভোলানাথ শঙ্করীর প্রেমনীরে ডুবিলে শান্তিময় কৈলাশে, আদ্যাশক্তি মহামায়ার মায়ায়—তাঁহাদের সংসারে—অভাবের আবির্ভাব হইল।

ইদানীং শিব ভিক্ষায় গমন রহিত করিয়া পার্ব্বতীকে লইয়াই মত্ত ছিলেন। আহার জোটাইবে কে? এদিকে খাইতে অনেকগুলি, কিন্তু কি খাইবে তাহার সংস্থান ছিল না। নির্ব্বিকার ত্র্যম্বক কিছুতেই কাতর হন না, কিন্তু সে দিন হঠাৎ ক্ষুধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভব-ক্ষুধা-হারী, ক্ষুধায় চক্ষু অন্ধকার দেখিলেন। হায়—মহামায়ার মায়া-প্রকাশ!

ক্ষুধা-পীড়িত শঙ্কর শঙ্করীকে ডাকিয়া অন্ন চাহিলে, তাঁহার প্রফুল্ল বদন গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কোথায় অন্ন পাইবেন;—ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়া পর্য্যন্ত কিছুই নাই। ভিক্ষুক যথা নিয়মে নিত্য ভিক্ষায় না গেলে, কে তার ঘরে আসিয়া অন্ন দিয়া যাইবে?

একে জঠরানলের বিষম জ্বালা, তার উপরে গৃহিণীর মুখ ভার;— শঙ্কর আর সহিতে পারিলেন না। যে ঈষৎ হাসিমুখে মুখ ফিরাইয়া চাহিলে ত্রিজগত আলো হইয়া উঠে, যাঁহার প্রসন্ন নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অমরার শুভ আশীর্ব্বাদ ঝরিতে থাকে, রোগ শোক, ক্ষুধা তৃষ্ণা, দুঃখ জ্বালা দূরে পলাইয়া যায়—তিনি মুখ ভার করিলে যে বিশ্ব সংসার অন্ধকার হইয়া যায়। তাঁহার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে যে বিশ্বের বন্ধন খসিয়া পড়ে! মহাদেব তা সহিবেন কেমন করিয়া?

যে সতীর জন্য শিব সর্ব্বত্যাগী, যাঁহার মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মাদের

ন্যায় তিনি জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, বিষ্ণু-চক্রে সতীদেহ কর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িলে, যাহার প্রত্যেক টুকরার নিকটে ভৈরববেশে তিনি স্বয়ং নিযুক্ত রহিয়াছেন, যে সতীর বিচ্ছেদে বিশ্বকার্য্য ছাড়িয়া তিনি দীর্ঘকালব্যাপী মহা সমাধিতে লীন ছিলেন, যে সতী শিবের কণ্ঠ-হার, মাথার মণি, ধ্যানের ইষ্টদেবী, কৈলাশের শোভা, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার নিখিল জগতের সর্ব্বস্বসার ভূষণ—সে সতীর অপ্রসন্ন কঠোর আনন শিব সহ্য করিবেন কেমন করিয়া? শক্তিরূপিনী সতী মুখ ফিরাইলে যে শিবের শিবত্ব লোপ হয়, শিব শব হইয়া পড়েন।

ক্ষুধানলের দহনে যত না হৌক, শঙ্করীর বিরস বদন দর্শনে শিবের হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। তখন তিনি অভিমানভরে পার্ব্বতীকে কতকগুলি মিষ্ট মিষ্ট র্ভৎসনা করিলেন।

পতির সে অভিমানস্ফুরিত বচনে সতীর হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল সতীপত্নীর প্রকৃত মনোভাব ও প্রকৃতি অবগত না হইয়া, বৃথায় অকারণে কটু কহিলে তাহা নারী হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। পার্ব্বতীও ব্যথিত অন্তরে পতির গুণগ্রামের ব্যাখ্যা করিয়া শিবকে সে সকল র্ভৎসনার প্রত্যুত্তর দিলেন। হায়—সদা জ্ঞানময় মহাযোগী আজ মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া—পার্ব্বতীর আন্তরিক শিবস্তুতি বুঝিতে না পারিয়া তৎসমুদয় গ্লানি বলিয়া মনে করিলেন।

হায়—পতি নিন্দা শুনিয়া দক্ষরাজ গৃহে যে সতী জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—তাঁহার সেই সতী কি এই? অভিমানে শিব আত্মহারা হইয়া পড়িলেন; এবং গৃহবাসে বিরক্ত হইয়া, তদ্দণ্ডেই নন্দীকে তাঁহার ভিক্ষা-গমন সজ্জা সকল আনিতে আদেশ করিলেন। যদি ভিক্ষাতেই কাল

কাটিল—তবে তাহাই কাটুক। কৃত্তিবাস আর বাসে ফিরিবেন না। ভিক্ষা করিয়া শ্মশানে শ্মশানেই দিন যাপন করিবেন।

শিব চলিয়া গেলে পার্ব্বতীও সে গৃহবাস পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন। তাঁহার শিবহীন গৃহ যে শ্মশান, তিনি কিরূপে তথায় বাস করিবেন? শক্তি ত শিব ছাড়া নহেন। শিব বিহনে আদ্যাশক্তিও যে শক্তিহারা—শব।

তখন পার্ব্বতীর সহচরী জয়া বিজয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'জানি না, মা তোমার এ কি লীলা? লীলাময়ী, এ লীলা সম্বরণ কর, আর এরূপ চক্ষে দেখিতে পারি না।

পার্ব্বতী যখন কহিলেন—'বিশ্বের কল্যাণে এ লীলা প্রয়োজন,' তখন সহচরীদ্বয় শান্ত হইল। তাহারা এই নূতন লীলা দেখিবার জন্য আগ্রহে উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল।

পার্ব্বতী তাহাদের সঙ্গে লইয়া কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ইচ্ছাশক্তি—মহাযোগ বলে—সমগ্র বিশ্বের অন্নরাশি আকর্ষণ করিয়া 'অন্নপূর্ণা' রূপে মন্দির আলো করিয়া বসিলেন। আকাশ হইতে দেবতারা—কিছু বুঝিতে না পারিয়া—স্তম্ভিত হইয়া এই লীলা দেখিতে লাগিলেন।

সে দিন বিশ্বের এক মহা নব-জীবনের দিন—মহা আনন্দের দিন।

ত্রিভুবনের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকবেশে পরিভ্রমণ করিয়াও, শিব যখন কোথাও একমুষ্টিও অন্ন ভিক্ষা পাইলেন না—তখন তিনি বড়ই বিস্মিত—বড়ই চমৎকৃত হইলেন। কাহারও গৃহে আজ একটা মাত্রও অন্ন ছিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শিব শেষে বৈকুণ্ঠে—লক্ষ্মীর দ্বারে—গিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কি দুর্ব্বিপাক—সে দিন লক্ষ্মীও—লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহেও তণ্ডুল কণামাত্রও ছিল না।

লক্ষ্মী যখন শিবকে জানাইলেন যে তিনিও আজ—নিরন্ন, শিব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। একি? লক্ষ্মীও আজ নিরন্ন—লক্ষ্মীছাড়া? তবে আর ত্রিসংসারে কোথায় অন্ন মিলবে? তিনি শূন্য মনে শ্মশানের দিকে গমনের জন্য ফিরিলেন। তখন লক্ষ্মী তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন যে তাঁহারই পার্ব্বতী, আজ কাশীতে গিয়া, ত্রিজগতের অন্ন আকর্ষণ পূর্ব্বক, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে জগৎকে অন্নদান করিতেছেন। ত্রিজগতের অন্য কোথাও আর আজ কণামাত্রও অন্নের সংস্থান নাই।

শিব তখন মহাশক্তির লীলা বুঝিয়া মনে মনে লজ্জিত হইলেন। এবং মহানন্দে নাচিতে নাচিতে, কাশীতে গিয়া অন্নপূর্ণা মহাশক্তির সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইলেন। মহামায়া ঈষৎ হাস্য করিয়া শিবের করে অন্ন দান করিলেন।

শিব-শক্তির মিলনে জগত আনন্দধাম হইল। কাশীতে মহামায়ার অপূর্ব্ব লীলা অন্নপূর্ণারূপ প্রকটিত হইল।

শৈব্যা

১

সে দিন মৃগয়া হইতে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যখন ফিরিতে দেরী হইতে লাগিল, তখন রাজরাণী শৈব্যা ভাবনায় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। রাজা কখনও মৃগয়ায় গিয়া অধিক বিলম্ব করিতেন না।

হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার রাজা—সূর্য্যবংশীয়। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ। তিনি সত্যব্রত—প্রজারঞ্জক—পরম ধার্ম্মিক। শৈব্যা তাঁহারই মহিষী। শৈব্যা—রমণীকুলের শিরোমণি—রূপেগুণে—সকল রকমেই রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রের উপযুক্ত মহিষী।

কিন্তু শৈব্যা বড় অভিমানিনী। কথায় কথায় শৈব্যার নিদারুণ অভিমানে হরিশ্চন্দ্রকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত। কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ ছিল—হরিশ্চন্দ্র ততটা তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই।

সূর্য্যবংশীয় রাজাদের যশঃ-সৌরভে দিগন্ত সুরভিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যব্রত, দানশীল, প্রজারঞ্জক এবং মহা বীর্য্যশালী ও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁহাদের রাজ্য মধ্যে বাস করিতে পাইলে লোকে স্বর্গবাসও তুচ্ছ করিত।

এমন জনপ্রিয় সূর্য্যবংশের বংশধর হইয়াও রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রথম প্রথম শৈব্যার অসাধারণ রূপ-গুণ দেখিয়া এমন মুগ্ধ ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন যে, রাজ্য,—রাজকার্য্য ও প্রজাগণকে ভুলিয়া অহোরাত্র কেবল অন্তঃপুরে—বিলাস ভবনে—কাটাইতে লাগিলেন।

পঞ্চম সতী

মহিষী শৈব্যা দেখিলেন—তাঁহার জন্য জগৎপূজ্য পতির বিমল যশ-ভাতিতে কলঙ্কের কালি পড়িবার উদ্যোগ হইয়াছে। তখন তিনি আপনার হৃদয়ের অপার স্নেহ, অগাধ প্রেম, অনন্ত ভালবাসা বাহ্যিক কঠোরতার আবরণে ঢাকিয়া পতিকে নিজের কর্ত্তব্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মহাশক্তিশালিনী রমণী আপনার মনের ভাব লুকাইয়া, বাহিরে অভিমানের ভাব দেখাইয়া রাজাকে কেবলই বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগি-লেন। হরিশ্চন্দ্র তখন শৈব্যার অভিমানের জ্বালায় ঝালাপালা হইয়া—রাজ সভায় গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং পুনরায় রাজকার্য্যের ভিতরে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন।

এমনি করিয়া সাধ্বী পত্নী কর্ত্তব্যচ্যুত স্বামীকে পুনরায় স্বধর্ম্মে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া দিলেন। কিন্তু রাজা বোধ করি পতিব্রতার হৃদয়ের সে মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না।

হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বদাই নানা প্রকারে পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু শৈব্যা যখনই দেখিতেন যে স্বামী রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বেশী-ক্ষণ অন্তঃপুরে রহিয়াছেন, তখনই অমনি ছুতানতা ধরিয়া অভিমানের ভাণ করিয়া—তাঁহার প্রতি বিমুখ হইতেন। সহস্র সাধ্য সাধনা ও চেষ্টাতেও সে দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিত না। কাজেই হরিশ্চন্দ্র ক্ষুণ্ণমনে রাজসভায় গিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপে যতই পত্নীর নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইতেন ; হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় কিন্তু ততই শৈব্যার প্রতি ধাবিত ও আকৃষ্ট হইত। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। তেমনি সময়ে এক ঘটনা ঘটিল।

দুই তিন দিন হইল রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন—কিন্তু ফিরেন নাই—

শৈব্যা অস্থির পরাণে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। রাজার ত কখন কোথাও এত বিলম্ব হয় না। তিনি ত শৈব্যাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও কোথাও সুস্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। তবে আজ এ কি হইল? তাঁহার এত বিলম্বের কারণ কি? শৈব্যা নানা চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলেন।

শিশুপুত্র রোহিতাশ্ব আসিয়া আপন অস্ত্রশিক্ষা দেখাইবার জন্য মাতাকে টানাটানি করিতে লাগিল। 'বাবা কখন ফিরবেন'—জিজ্ঞাসা করিয়া আরও আকুল করিয়া তুলিল। শৈব্যা আপনার হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিয়া নানা প্রকার ছলে পুত্রকে ভুলাইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে—সহাস্যমুখে ধীরে ধীরে—হরিশ্চন্দ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শৈব্যা দেখিলেন—স্বামীর স্বভাবে কি যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রফুল্ল মুখের হাসির ভিতর হইতে কি যেন একটা বিষাদের ছায়া উঁকি মারিতেছে। তিনি যেন অন্তরে কোন একটা গুরুতর বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, ভয়ে তাহা পত্নীর নিকটে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

একটা অনিশ্চিত আতঙ্কে শৈব্যার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—কি ঘটিয়াছে জানিবার জন্য—পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিলেন।

২

বিশ্বামিত্র—প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াও—আপন তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবতারা যে পদে পদে বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলেন নাই। তাই তাঁহাদের প্রতি বিশ্বামিত্রের বিষম ক্রোধ, বিরক্তি এমন কি ঘৃণাও জন্মিয়াছিল। তিনি পদে পদে দেবতাদিগকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিষম তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিয়াও তিনি ধর্ম্মের মহত্ত্ব—ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। যে যত প্রাণপাত চেষ্টায় ধর্ম্মপথে পড়িয়া থাকে—সেই সংসারে তত অধিক পরিমাণে কষ্ট পাইয়া থাকে। তবে আর ধর্ম্মের প্রভাব, ধর্ম্মের মহত্ত্ব—ধার্ম্মিকের মর্য্যাদা রহিল কোথায়?

তাই তিনি সকল দেবতাগণকে জয় করিয়া নিজের স্বভাব বিস্তারের জন্য এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। শাপভ্রষ্টা কয়েকজন অপ্সরা সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের তপোবনে উপস্থিত ছিল। ঋষিবর দেবতাদিগের প্রতি আক্রোশে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া আপন যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

অযোধ্যা রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী বিশাল বন মধ্য ভাগে বিশ্বামিত্রের তপোবন। সেইখানে বাঁধা পড়িয়া অপ্সরাগণ প্রাণের দায়ে—চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে অযোধ্যা-রাজ হরিশ্চন্দ্রের—জীবনে যাহা ঘটে নাই—আজ তাহাই ঘটিতে বসিল। মৃগয়াতে গিয়া অনবরতঃ তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে

লাগিল। তিনি প্রাণপণ চেষ্টাতেও একটা বরাহকে মারিতে পারিলেন না। বার বার ব্যর্থ হইয়া—তাঁহার অন্তরে রুদ্ধ ক্ষত্রিয় বীর্য্য গর্জ্জন করিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং স্থান কাল, রাজ্য, রাজধানী, স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী সকল ভুলিয়া শিকারের পিছনে পিছনে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। তাহার সঙ্গের লোকজন আর তাঁহার গতি নির্ণয় করিতে পারিল না সকলে পশ্চাতে—বহুদূরে পড়িয়া রহিল।

এমনি করিয়া—বরাহের পিছনে পিছনে—এ বন হইতে সে বন ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ এক বনের ভিতরে—

রমণীর কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কারণ স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ক্ষণেক তথায় বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর সেই ক্রন্দনের অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

হঠাৎ একস্থানে আসিয়া হরিশ্চন্দ্র বিস্মিত হইয়া দেখিলেন— সম্মুখে এক রমণীয় তপোবন, এবং সেই তপোবনের ভিতর হইতেই আর্ত্তনাদ-ধ্বনি উঠিতেছে। তিনি কম্পিত চরণে তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

অবলার আর্ত্তনাদে কাতর হইয়া হরিশ্চন্দ্র অপ্সরাগণের বন্ধন মোচন করিলেন, তাহারা শাপমুক্ত হইয়া মহানন্দে দিব্যধামে প্রস্থান করিল। হরিশ্চন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু হায় তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তাঁহার অজ্ঞাতে অদূরেই আর এক মহা বিভীষিকার সূচনা হইতেছিল।

অপ্সরাগণকে বাঁধিয়া রাখিয়া বিশ্বামিত্র একমনে আপন যজ্ঞ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অতর্কিত নর সমাগমে, সহসা তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য

উপস্থিত হইল। তারপর মুক্ত অপ্সরাসকলের সমবেত আনন্দধ্বনিতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, মহাযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিল। তিনি কম্পিত কলেবরে রোষারক্তলোচনে চাহিয়া দেখিলেন—এক অস্ত্রধারী যোদ্ধৃপুরুষ তাঁহার বিনানুমতিতে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শান্তিভঙ্গ ও যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এক বিষম হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। হরিশ্চন্দ্র চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—রোষ-বিদগ্ধ কম্পিত কলেবর অগ্নিমূর্ত্তি বিশ্বামিত্র!

নিমেষে ত্রিভুবন যেন তাঁহার পদতল হইতে সরিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ—স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া এতক্ষণ তিনি এদিকে ফিরিয়া চাহিবার সময় পান নাই! তিনি মহাভয়ে কম্পিত কলেবরে তাড়াতাড়ি গিয়া ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বিশ্বামিত্র যখন শুনিলেন যে হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে ব্যথিতান্তঃকরণে ক্ষাত্রধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া আশ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন, তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন—যে রাজা এরূপ অবিবেচক তাহার রাজদণ্ড ধারণ ধৃষ্টতা মাত্র, রাজ্য বিলাইয়া দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—যে উপযুক্ত পাত্র পাইলে তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ নহেন।

তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে সে রাজ্য দান চাহিলেন—ক্ষত্রিয়দের কাছে উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম আর ছিল না। দানবীর হরিশ্চন্দ্র আনন্দের সহিত এক কথায় বিশ্বামিত্রকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া বসিলেন। হরিশ্চন্দ্র সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট।



হরিশ্চন্দ্রকর্ত্তৃক পঞ্চ কন্যার বন্ধনমুক্তি।

হরিশ্চন্দ্রের মহত্বে বিশ্বামিত্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মতেজ কত প্রবল তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এক উপলক্ষ মিলিল—দক্ষিণা ভিন্ন দান সিদ্ধ হয় না। বিশ্বামিত্র দক্ষিণা চাহিলেন। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সহস্র স্বুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া ফেলিয়াছেন, স্থতরাং সেই রাজ্যের কোন অর্থাদিতে তাঁহার আর অধিকার নাই। তিনি নিজে, তাঁহার পত্নী এবং পুত্র ব্যতীত আর তাঁহার নিজস্ব কিছুই নাই। এমন কি তাঁহার দানকরা পৃথিবীর মধ্যে বাস করাও তাঁহার পক্ষে নিষেধ—মহাপাতকের কাজ।

তখন হরিশ্চন্দ্রের জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। সত্যই ত, তিনি যে এইমাত্র এক কথায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া দীনহীন পথের ভিক্ষুক হইয়াছেন,—দক্ষিণার সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা কোথা হইতে দিবেন?

তথাপি হরিশ্চন্দ্র কাতর হইলেন না। তিনি ঋষিবরের নিকট অতি বিনীতভাবে করযোড়ে একমাস সময় প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি, যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহার দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ করিবেন। বিশ্বামিত্র সম্মত হইলেন।

কিন্তু তিনি যাইবেন কোথা?—সসাগরা ধরার কোথাও ত স্থান নাই। সহসা তাঁহার স্মরণ হইল 'কাশীধাম' পৃথিবীর অন্তর্গত নহে—শিবের ত্রিশূলের উপরে স্থাপিত। তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিলেন।

তখন মনে মনে কাশীযাত্রার সংকল্প স্থির করিয়া হরিশ্চন্দ্র রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্তোষ বিধানের জন্য পৃথিবী দান ক'রেছেন, কিন্তু কার সন্তোষের জন্য ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করছেন? স্বামী স্ত্রীর বন্ধন যে জীবনে মরণে দুশ্ছেদ্য। পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গ—অনন্তকালের সঙ্গিনী, তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবেন? আপনি যখন রাজা ছিলেন—আমি রাজরাণী ছিলাম। আপনি এখন ভিখারী—আমিও ভিখারিণী। আপনি আদর করিতেন তাই আদরিণী ছিলাম, আপনি অভিমান সহিতেন—তাই অভিমান করিতাম, আপনি গৌরব বাড়াইতেন তাই গরবিনী ছিলাম। আমার মান অপমান সোহাগ আদর গৌরব সবই আপনি, আমার সারাজগৎ যে আপনাময়—আপনাকে লইয়া, আমার তো আর পৃথক সত্বা নাই—আমি যে আপনারই একাংশ। তবে আমাকে আপনি কিরূপে পরিত্যাগ করিবেন? মহারাজ, যেখানে আমার পতি—সেইখানেই আমার সাম্রাজ্য সেইখানেই আমার স্বর্গ। আপনাকে ছাড়িয়া আমি একদণ্ডও কোথাও থাকিব না—থাকিতে পারিব না। দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লউন।'

পত্নীর কথায় হরিশ্চন্দ্র নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। ইহার উপর তিনি আর কি উত্তর করিবেন? তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া এতদিন শৈব্যাকে বুঝিতে পারেন নাই—চিনিতে পারেন নাই। আজ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পথের ভিখারী হইয়া—তাঁহাকে বুঝিলেন, চিনিলেন। তিনি তাঁহার এই মহাত্যাগের ভিতরে আজ যে অত্যুজ্জ্বল অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইলেন তাহার তুলনা কি এ জগতে আর দ্বিতীয় আছে? আজ তাঁহার অপেক্ষা বেশী ভাগ্যবান কে? আজ তাঁহার অপেক্ষা বেশী সুখী কে? তিনি আজ ভিখারী হইয়াও—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, দীনহীন

কাঙ্গাল হইয়াও—পৃথিবীর সম্রাট! পত্নীর-গৌরবে হরিশ্চন্দ্রের বুক দশগুণ ফুলিয়া উঠিল!

তখন মহানন্দে হরিশ্চন্দ্র সমস্ত রাজবেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া একবস্ত্রে, পত্নীও পুত্রের হাত ধরিয়া রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ লক্ষ প্রজা শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগের চারিদিকে ঘিরিল। তিনি সকলকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া, পত্নী ও পুত্র লইয়া একবস্ত্রে বিনাসম্বলে দীর্ঘপথ হাঁটিতে হাঁটিতে কাশী অভিমুখে চলিলেন।

৪

এদিকে নিজের ইচ্ছায় যে বিপুল সাম্রাজ্য ছাড়িয়া বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে দান লওয়ার ফলে আবার যখন তেমনি রাজ্যভার ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িল, তখন তিনিও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার তপ জপ ও সাধনার অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। কিন্তু তবুও তিনি হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়বল ও ধর্ম্মের নর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্তই অম্লান বদনে সহ্য করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র তাঁহার দক্ষিণার ঋণ পরিশোধের জন্য একমাসের সময় লইয়াছিলেন—সেই একমাস পূর্ণ হইতে চলিল। বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিলেন না যে একমাত্র ছিন্ন বস্ত্র ধারী ভিক্ষাজীবি হরিশ্চন্দ্র কোথা হইতে তাঁহার দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ করিবেন? কে তাঁহাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিবে? দিলেও বা, ক্ষত্রিয় হইয়া—তিনি কিরূপে সেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন? তথাপি তিনি হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মবল পরীক্ষা করিবার জন্য কাশী যাত্রা করিলেন।

বিশ্বামিত্রের রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পরে, বহুপ্রজাই হরিশ্চন্দ্রের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, এবং ঋষির ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া—রাজধানী ছাড়িয়া গিয়াছিল। সেই আনন্দময় বিশাল অযোধ্যাপুরী জনশূন্য নিরানন্দ শ্মশানের মতই হইয়া গিয়াছিল। তবুও বিশ্বামিত্র টলেন নাই। কিন্তু আজ তাঁহাকে পথে যাইতে দেখিয়া, সমস্ত লোকেরাই ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া, দূরে

দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রের দুঃখে তাহাদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস তপ্তশলাকার মত—বিশ্বামিত্রের কর্ণে বিঁধিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র ভাবিলেন—পথের কাঙ্গাল, দীনহীন ভিখারী হইয়াও আজ হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছেন। রাজা, বেশ নিশ্চিন্ত মনে অন্নপূর্ণার ক্রোড়ে বসিয়া—দিবারাত্রি, "মা মা" করিয়া ডাকিতেছেন। কোটী কোটী ভক্ত প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার গুণগানে আজ পৃথিবী মুখরিত হইয়া গিয়াছে। আর তিনি হইয়াছেন কি? ব্রাহ্মণত্ব পাইবার জন্য অকাতরে নিজের সাম্রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়া, আবার মোহে পড়িয়া—সেই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, ক্রিয়া কলাপ, সাধন, ভজন, সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন। এমন কি, নিরালায় নিশ্চিন্ত বসিয়া যে দুইদণ্ড ভগবৎ চরণ ধ্যান করিবেন—তাহার ও অবসর নাই।

একবার বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা হইল—হরিশ্চন্দ্রকে সমাদরে ডাকিয়া আনিয়া রাজ্যভার ফিরাইয়া দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেবতাদের উপর সুপ্ত ঘৃণা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—তিনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। সে সময় এখনও আসে নাই, ধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মবল পরীক্ষার এখনও বিস্তর বাকী। এখনও, ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতাদের দর্প চূর্ণ হয় নাই।

বিশ্বামিত্র দক্ষিণার অর্থ আদায় করিবার জন্য হরিশ্চন্দ্রের উদ্দেশে কাশী অভিমুখে চলিলেন।

৫

কাশীতে আসিয়া, হরিশ্চন্দ্র নগরের প্রান্তভাগে একখানি অতি জীর্ণ পর্ণকুটীরে, স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় কুসুম সুরভি চর্চ্চিত হইয়া শয়নেও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, সেই রাজা রাণী আজ, কঠোর মৃত্তিকাতলে সামান্য একখানি বস্ত্র বিছাইয়া উপাধান-হীন শয্যায় শয়ন করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ পাচককুলের সযত্ন প্রস্তুত নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্যেও যাঁহাদের তৃপ্তি হইত না, আজ দাতব্য অন্নসত্রের সামান্য অন্নেই তাঁহারা উদর পূরণ করিতে লাগিলেন। সহস্র দাস দাসীর পরিচর্য্যাতেও যাঁহাদের মন উঠিত না, আজ তাঁহারা স্বাবলম্বনে আপনাদের পরিচর্য্যাতেই সন্তুষ্ট।

বস্তুতঃ কাশীতে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া হরিশ্চন্দ্র যেন পরম আরাম পাইতে লাগিলেন। সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আসিয়া এই দীনতার মধ্যে তিনি আজ অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছেন। এতদিন রাজ্যৈশ্বর্য্যের মধ্যে যে সুখ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল—আজ এই মহা দৈন্যের ভিতরে তিনি সে সুখের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার সে সুখের মূল ও একমাত্র আধার—পতিব্রতা শৈব্যা।

শৈব্যা আর এখন রাজরাণী নহেন। তাঁহার আর সে সোহাগ, সে গরব, সে অভিমান কিছুই ছিল না। তিনি এখন সেই ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, দীনের সম্বল—অনাথের আশা—

আর্ত্তের অবলম্বন—হতাশের শরণ—মহামহিমময়ী শক্তিমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। স্নেহ পরিপ্লুত মাতৃমূর্ত্তির সহিত দরিদ্রের গৃহে আলোক-দায়িনী লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া শৈব্যা দীন হীন কপর্দ্দকশূন্য অনাথ হরিশ্চন্দ্রের দীন আবাসটুকু এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ শান্তিতে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই জীর্ণ পর্ণকুটীর খানি, সেই আসবাব ও আড়ম্বর শূন্য প্রস্তর-কঠিন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহতল, শৈব্যার অলৌকিক পুণ্য ও করুণা প্রবাহে রাজরাজেশ্বরের রত্নমণ্ডিত উন্নত প্রাসাদ এবং উজ্জ্বল স্বর্ণসিংহাসনকেও মলিন করিয়া দিয়াছিল। এ সুখের বিনিময়ে হরিশ্চন্দ্র বুঝিবা স্বর্গরাজ্যও চাহিতেন না।

প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শৈব্যা গৃহকর্ম্ম সকল সমাধান পূর্ব্বক, স্নানান্তে স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া আনিতেন। পরে পতিপুত্রকে স্নান করাইয়া হরিশ্চন্দ্রের পূজা আহ্নিকের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। শিশুপুত্রও—পিতার দেখাদেখি—তাঁহার সহিত বসিয়া দেবপূজার বিধি শিক্ষা করিত। বালক যখন ধ্যাননীমিলিত পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া—তাঁহারই মত—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার শিশু-হৃদয়ে দেবচিত্র প্রতিফলিত করিয়া লইবার প্রয়াস পাইত, অথবা কল্পিত দেব চরণোদ্দেশে, একটি একটি করিয়া সুরভিকুসুমরাশি চন্দন মাখাইয়া মাখাইয়া প্রদান করিত, তখন তাহার অনাবিল সরল বদনমণ্ডলে যে-পবিত্র দেবভাবটুকু বিকশিত হইয়া উঠিত তাহা দেখিতে দেখিতে শৈব্যা আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইতেন। তাঁহার আর সুখের সীমা থাকিত না। তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বেশ্বরের চরণে পতিপুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া লইতেন।

প্রাভাতিক উপাসনান্তে রোহিতাশ্ব যখন পিতৃক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার

নিকট হইতে বিদ্যাভ্যাস ও নানাপ্রকার উপদেশাদি গ্রহণ করিত, এবং তাহার সুমধুর বালকণ্ঠে তৎসমুদয়ের আবৃত্তি করিত তখন গৃহকর্ম্মে নিরতা শৈব্যার কর্ণে, অপ্সর সঙ্গীতের অপেক্ষাও সে সকল মধুর লাগিত। রাজধানীতে সহস্র যন্ত্র সম্মিলিত সুকণ্ঠ গায়ক গায়িকাদিগের সুধামাখা সঙ্গীতেও, বুঝি এমন শ্রুতিসুখ তিনি একদিনের জন্যও অনুভব করেন নাই।

মধ্যাহ্নে স্বহস্তে তিনি দেব-প্রসাদ আনয়ন পূর্ব্বক পতিপুত্রকে ভোজন করাইতেন। এবং পতির ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পড়িয়া থাকিত তাহাতেই নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পরম শান্তিলাভ করিতেন। আহারান্তে পতিপদ-সেবায় নিরতা হইয়া, পতিব্রতা, পতির মুখোচ্চারিত নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রকথা সকল শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মনে হইত—এ নির্ব্বিবাদ নীরব দৈন্যের মধ্যে যে সুখ যে শান্তি নিহিত রহিয়াছে,—সসাগরা ধরার রাজধানীর ক্রোড়ে, নানা বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সাম্রাজ্ঞীরূপে থাকিয়াও তিনি যেন কখনও একটি দিনের জন্যও তাহার আস্বাদ পান নাই।

হরিশ্চন্দ্র ভাবিতেন—হায়, যদি বিপদ ও দৈন্যের ক্রোড়ে এত সুখ, এত শান্তি, এত পুণ্য, এত পবিত্রতা লাভ করা যায়,—তবে লোকে ঐশ্বর্য্যের জন্য বৃথা লালায়িত হয় কেন?

৬

মহাদৈন্যের মধ্যেও এইরূপ সুখ শান্তিতেই রাজচক্রবর্ত্তীর দিন কাটিতে লাগিল। তিনি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সিংহাসন, প্রজা, পৃথিবী সকল ভুলিয়া শৈব্যাতে মগ্ন হইলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিক শৈব্যাময় হইয়া উঠিল। শৈব্যা ভিন্ন, তাঁহার নিকটে, এই বিশাল পৃথিবীর আর অন্য সত্তা রহিল না। কিন্তু হায় এক চিন্তা এই নির্ব্বিবাদ শান্তি সুখের মধ্যেও তীক্ষ্ণ শলাকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছিল।

তিনি বিশ্বামিত্রের নিকটে সহস্র সুবর্ণমুদ্রার জন্য ঋণী। তিনি বহু সাধ্য সাধনায়, ঋণ পরিশোধের জন্য যে একমাস সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও ত দেখিতে দেখিতে পূর্ণ হইয়া আসিল। এক্ষণে কোথা হইতে তিনি সে ঋণ পরিশোধ করিবেন?

হরিশ্চন্দ্র এই একমাস ধরিয়া প্রাণপাত চেষ্টায় একটা কোন কর্ম্মের জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছেন—কিন্তু কোথাও মিলে নাই। তীর্থস্থান কাশীতে কে তাঁহাকে ক্ষত্রোচিত কর্ম্ম দিবে? সামান্য ছোট খাট কর্ম্মের জোগাড় হইলেও বা, তাহা হইতে তিনি কিরূপে ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত সহস্র সুবর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিবেন? এদিকে তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়—তাঁহার পক্ষে ভিক্ষাও নিষিদ্ধ। তবে কিরূপে কোথা হইতে তিনি এত সুবর্ণের সংস্থান করিবেন? হরিশ্চন্দ্র চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে তাঁহার প্রার্থিত একমাস সময়ও পূর্ণ হইতে চলিল—অথচ তিনি ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত এক কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চিত জানিতেন, যে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে তাঁহাব আর কোনও দিকে নিস্তার থাকিবে না। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাতে তাঁহারা তিনজনে তো ভস্মীভূত হইবেনই,—অধিকন্তু সেই ভীষণ শাপে সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি কলাপ সমস্তই লোপ পাইবে, উর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ হইবে। তিনি নিজে ভস্মীভূত হউন, তাহাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মফলে, তাঁহার অবিবেচনার দোষে যে তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষের অনন্ত দুর্গতি ভোগ হইবে, এবং বিশ্ববিশ্রুত পূত সূর্যাবংশের কীর্ত্তি কলাপ ধ্বংশ হইবে, ইহা তিনি কোন প্রাণে সহ্য করিবেন ?

হায় হায়, কেন তিনি নিজের সামর্থ্য না বুঝিয়া বাক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন ? কেন তিনি ধর্ম্ম ও সত্যপালনের দর্পে স্ফীত হইয়া অন্ধ হইয়াছিলেন ? দর্পহারী মধুসূদন তাঁহার সেই দর্প চূর্ণ করিবার মানসেই তাই বুঝি আজ তাঁহাকে এ দুস্তার বিপদ-সাগরে ফেলিয়াছেন !

ওঃ ঋণ কি ভয়ানক বস্তু ! জগতে যত প্রকার বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে—ঋণ বোধ হয় তাহাদের সকলের উচ্চে। ঋণের ন্যায় মহাপাতক জগতে বুঝি আর দ্বিতীয় নাই। ঋণগ্রস্ত মহাপাপী—নরহত্যাকারী মহাপাতকী অপেক্ষাও বুঝি অধিকতর অপরাধী। এ জগতে তাহার নিস্তার নাই, পরজগতেও বুঝিবা তাহার উদ্ধার নাই। সে চোর অপেক্ষাও পীড়নের পাত্র—কুক্কুর অপেক্ষাও ঘৃণ্য। ঋণগ্রস্ত হতভাগা বিদ্যাবুদ্ধি, গৌরব গরিমা, মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া, উত্তমর্ণের আশঙ্কায়, সর্ব্বদাই

পৃথিবীর বুকে মুখ লুকাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। শুষ্কপত্রের মর্ম্মরে, সে শঙ্কিত হয়, শিশুর সরল উচ্চহাস্যধ্বনিতেও চমকিত হইয়া উঠে। তাহার নিকটে পৃথিবীর সুখশান্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। হতভাগা আকুল প্রাণে নিয়ত মরণ কামনা করে।

হায় আজ যদি হরিশ্চন্দ্রের ঋণ না থাকিত, তাহা হইলে, তাঁহার মত সুখী আর দ্বিতীয় কে ছিল? রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমস্তই গিয়াছিল বটে, তথাপি দীনের পূর্ণকুটীরে বাস করিয়া তিনি যে তদপেক্ষা অধিক সুখ, অধিক শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। এ সুখশান্তির তুলনায় রাজৈশ্বর্য্য ত অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য। কিন্তু হায়—নিষ্ঠুর ভবিতব্য! আজ তিনি ঋণী!

হায় হায় কি কুক্ষণেই তিনি ধর্ম্ম দর্পে স্ফীত হইয়াছিলেন! কি অশুভক্ষণেই তিনি আপন অবস্থা না ভাবিয়া ঋণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন! কিসের দান—কিসের ধর্ম্ম? যে ঋণী তার আবার দান ধর্ম্ম কি? তার আবার গর্ব্ব কি? তার আবার পুণ্যসঞ্চয় কি? তার আবার বাক্যদান কি? হরিশ্চন্দ্রের মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। সেই ভীষণ অন্ধকাররাশির মধ্যে, মূর্ত্তিমান বিভাবসুর ন্যায়, রোষদগ্ধ বিশ্বামিত্রের বিশ্বনাশী মূর্ত্তি দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

হরিশ্চন্দ্র আর সহিতে পারিলেন না। দুই হস্তে সজোরে আপন মস্তক চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্তর-কঠিন মৃত্তিকার উপরে বসিয়া পড়িলেন।

রজনী প্রভাত হইলেই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, কোনও দিকে পরিত্রাণের কোনও পন্থা ছিল না।

৭

হায় পতিব্রতা শৈব্যা!—তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তিনি কি উপায়ে, কি বলিয়া, কি প্রকারে পতিকে সান্ত্বনা করিবেন? তাঁহার আপনার হৃদয় ভাঙ্গিয়া শত খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল। তিনি তাহা অতিকষ্টে চাপিয়া নানা উপায়ে পতিকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু হায় কি বলিয়া আর প্রবোধ দিবেন? সে অবস্থা যে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রাণে প্রাণে ঐকান্তিক চিত্তে কেবলই বিশ্বেশ্বরকে ডাকিতেছিলেন।

সহসা তাঁহার মস্তিষ্কে এক উপায়ের চিন্তা আসিল। পতিপুত্রের মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবস্থানে হত্যা দিলে হয় না?

মানুষ যখন নিরাশ হইয়া পড়ে, কোনও দিকে আর অবলম্বনের সূক্ষ্ম সূতাগাছি পর্য্যন্ত থাকে না, তখন সে কায়মনোপ্রাণে দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। ইহা মানব স্বভাবের ধর্ম্ম। সুখ সম্পদের দিনে যে হৃদয় জগদীশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, দুঃখ ও বিপদে পড়িলে, সেই তখন হৃদয়ের সমস্ত সুপ্তভক্তি ও বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিয়া ঐকান্তিক নির্ভরে দেবতার চরণ জড়াইয়া ধরে।

হরিশ্চন্দ্রের কুটীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে অধিক দূর ছিল না। পতিপুত্র ঘুমাইলে, তাঁহাদের প্রাভাতিক পূজাহ্নিকের আয়োজন সমস্তই সাজাইয়া রাখিয়া, এবং আবশ্যকীয় গৃহকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া,—শৈব্যা, রজনীর

শেষ যামে সন্তর্পণে উঠিয়া, একাকিনী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িলেন।

হরিশ্চন্দ্রও অতি প্রত্যূষে উঠিলেন। তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্যের জন্য রজনীতে ভালরূপ নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। আজ বিশ্বামিত্রের নিকটে গৃহীত এক মাস পূর্ণ হইল—আজ তাঁহার সর্ব্বনাশের দিন।

প্রত্যূষে উঠিয়াও তিনি শৈব্যাকে দেখিতে পাইলেন না। যে শুক্ তারার বিমল রশ্মিতে তাঁহার প্রতি রজনী অন্তে মঙ্গলময় সুপ্রভাত দেখা দিত—আজ আর তাঁহার হৃদয়—গগনে সে তারাটি উঠিল না—আজ শৈব্যাকে দেখিতে পাইলেন না। কে জানে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন-গগণে সে তারাটি, কতকালের জন্য এরূপে অদৃশ্য থাকিবে?

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন—সেই অতি প্রত্যূষেই গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহার পূজাহ্নিকের উপকরণ সকল সজ্জিত রহিয়াছে—কিন্তু শৈব্যা নাই। শৈব্যা কি তবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই? রজনী থাকিতেই গৃহকর্ম্ম সকল সমাধা করিয়াছেন? তাঁহার পূজাহ্নিকের আয়োজন পর্য্যন্ত করিয়া রাখিয়াছেন,—কিন্তু এত প্রত্যূষে তিনি গেলেন কোথায়? হরিশ্চন্দ্র ভাবিলেন—তিনি নিকটেই হয়ত বা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছেন। নিজের মনশ্চাঞ্চল্য বিদূরিত করিবার জন্য এবং দেব প্রসাদ লাভাশয়ে অতি প্রত্যূষেই তিনি পূজাহ্নিকে বসিলেন।

আজ তাঁহার অদৃষ্টপটে কি অঙ্কিত ছিল কে বলিবে? তিনি আজ নিতান্ত কাতর হইয়া ঐকান্তিক ভক্তিভরে বহুক্ষণ ধরিয়া ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী, পুত্র এবং বংশ গৌরব রক্ষা করিবার জন্য দেবতার চরণে সহস্র কাতর প্রার্থনা জানাইলেন।

পথে ও সতী

তাঁহার মন আজ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় মুহুর্মুহুঃ তাঁহার হৃৎকম্প হইতেছিল, একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কে তিনি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া ছিলেন। বিশ্বামিত্রের অগ্নিমূর্ত্তি তাঁহার আশে পাশে নৃত্য করিতেছিল। তিনি ঘন ঘন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

পূজাহ্নিক শেষ হইয়া গেল—শৈব্যা আসিলেন না। তিনি আরও ক্ষণেক অপেক্ষা করিলেন—শৈব্যার দেখা নাই। তখন কি যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রোহিতাশ্বকে সঙ্গে লইয়া পত্নীর অন্বেষণে বাহির হইলেন।

প্রথমেই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দেবপ্রণামান্তর ইতস্ততঃ চাহিতেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি দেখিলেন—পতি-মঙ্গল-কামনা-ব্যাকুলা তাঁহার সাধ্বী পত্নী বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে অবহিত-চিত্তে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রের নয়ন যুগল অশ্রুপ্লাবিত হইল। হায়! এই তাঁহার সেই ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী রাজরাণী—সেই আদরিণী—সেই গরবিনী—সেই কথায় কথায় অভিমানিনী শৈব্যা!

পতীর মঙ্গল কামনায় সতীর হৃদয় যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল—এই দৃশ্যের পরে আর তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ দৃশ্য দর্শনে হরিশ্চন্দ্র আর কোন মতেই আত্ম সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া—একদৃষ্টে পত্নীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর সময়ে শৈব্যা উঠিলেন। সম্মুখেই পতি-পুত্রকে

দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখন আর কিছু না বলিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

একটা মোড় ফিরিতেই সকলে সশঙ্কিত-চিত্তে দেখিলেন—সর্ব্বনাশ—সম্মুখে—তেজস্বী বিশ্বামিত্র!—হায় নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

৮

বিশ্বামিত্র রাজার প্রতিশ্রুত দক্ষিণার অর্থ চাহিলে, হরিশ্চন্দ্র নীরবে অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি উত্তর দিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার সম্মুখে সমগ্র জগৎ ঘুরিতেছিল।

হরিশ্চন্দ্রকে সেইরূপে নীরবে থাকিতে দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে জানাইলেন—যে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে,—তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ হইবেন, এবং সূর্য্যবংশের সমুদয় কীর্ত্তি বিনষ্ট হইবে।

বিশ্বামিত্রের কথায় হরিশ্চন্দ্রের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তিনি অতি বিনীতস্বরে করযোড়ে জানাইলেন যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, ঋণের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মুকুট বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ধনুর্দ্ধারণের ক্ষমতা গিয়াছে; জাতিতে ক্ষত্রিয়—সুতরাং ভিক্ষাও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। এ তীর্থস্থানে কেহই তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া তাঁহাকে কোন প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহে না। সুতরাং তাঁহার আর উপায় কি? তাঁহার নিজের একবস্ত্র ও পুত্র এবং পত্নী ভিন্ন অন্য কিছুই সম্বল নাই। তিনি কিরূপে এই বিষম ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন? দুই চক্ষু দিয়া বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহ বহিয়া হরিশ্চন্দ্রের বক্ষ ভাসাইয়া দিল।

কিন্তু ঋষির কঠিন অন্তঃকরণ তাহাতে বিচলিত হইল না। তিনি ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের পরীক্ষা লইতে আসিয়াছেন। ব্যঙ্গ পূর্ণ রূঢ়স্বরে তিনি

রাজাকে যথোচিত কটূক্তি করিলেন ও লজ্জা দিতে লাগিলেন। তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

যাহার সামর্থ্য নাই—সে দান করে কেন? তাহার আবার ধর্ম্মের ভান কেন? বিশ্বামিত্র—বনবাসী তপস্বী, সুদখোর মহাজন নহেন—যে নিরন্তর ঋণপত্র হস্তে যাতায়াত করিবেন। যদি না দিতেই পারিবেন, তবে হরিশ্চন্দ্র এরূপ নাম কিনিবার জন্য, মিথ্যা লোক-দেখান দান করিয়াছিলেন কেন? আর ব্রাহ্মণকে মিথ্যা বাক্যদান করিয়াই বা এরূপ কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? তিনি তো আর বলপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আসেন নাই। এরূপ মিথ্যা দানের ভান করিবার কি প্রয়োজন ছিল? এখনও হরিশ্চন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলুন—যে তিনি দিতে পারিবেন না, বিশ্বামিত্র তাঁহার রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্তই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন।

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন—যে বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় তিনি ফিরিয়া গেলে—তাঁহার গমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-কোপানলে সর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। তিনি গিয়া রোষকম্পিত কলেবর ঋষির পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

হরিশ্চন্দ্র—সর্ব্বাপেক্ষা মহাবল—সত্যের বলে আবদ্ধ, তিনি কেমন করিয়া বলিবেন যে দিতে পারিবেন না? কিন্তু তাঁহার উপায় কৈ?

বিশ্বামিত্র তখন ক্রোধে একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। নিরতিশয় কঠোরস্বরে পশ্চিম গগনপ্রান্তে দেখাইয়া কহিলেন, যে ওরূপ অভিনয় তিনি বিস্তর দেখিয়াছেন, আর দেখিতে ইচ্ছুক নহেন। রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া পশ্চিমাকাশে ঐ সূর্য্য অস্তগমন করিতেছেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে

দক্ষিণার ঋণ শোধ না হইলে, তাঁহার আর হরিশ্চন্দ্রকে রক্ষা করিবার সাধ্য হইবে না। তিনি ঋণী হইয়াও কি এতদিন দিন গণনা করেন নাই, এ অতি বিচিত্র কথা। যে ঋণী, সে কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া আহার করে ও নিদ্রা যায় ?

অতি সত্য কথা। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের ত উপায়ান্তর ছিল না। তিনি বিশ্বামিত্রের পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক—তাঁহাকে আপন সেবায় নিযুক্ত করিয়া—তাঁহার ঋণের অর্থ পরিশোধ করিয়া লইবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা শৈব্যা পতির লাঞ্ছনা দর্শনে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছিলেন। তিনিও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, পতিসহ ঋষির পদযুগে পতিত হইলেন। বালক রোহিতাশ্ব একান্তে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। তাহার প্রাণে কি হইল জানি না—কিন্তু পিতামাতার দেখাদেখি, সেও গিয়া বিশ্বামিত্রের পদতলে পতিত হইল। কাশীর পথবাসী নানা লোক এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া তাহাদের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

তখন বিশ্বামিত্র ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলেন—তিনি তপস্বী—তাঁহার দাসদাসীর প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ রাজ-দাস পালন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু তা বলিয়া এই বারাণসী ধামে অপরের তো তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে। দাসের ত সর্ব্বসময়েই সেবা বিক্রয়ের অধিকার আছে। হরিশ্চন্দ্র তো অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতী,—পত্নী পুত্র অপেক্ষা জগতে আর অধিক ঐশ্বর্য্য কি আছে ? সেই পত্নী পুত্র—হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে রহিয়াছে। তিনি মনে করিলে কি আর দক্ষিণার এই সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন না ? তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে

পারিতেন। ইচ্ছা নাই—তাই পারিতেছেন না। তবে আর এ বৃথা ভান ও অভিনয়ের প্রয়োজন কি? বিরক্ত হইয়া বিশ্বামিত্র পদযুগল টানিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। পুনশ্চ হরিশ্চন্দ্রকে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিতে বলিলেন।

রাজা রাণী উঠিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কি ভয়ানক কথা! মনে হইতেই হরিশ্চন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে যেন বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যিক ক্রিয়া লোপ পাইল। তিনি উন্মাদের ন্যায় ভাবহীন শূন্য দৃষ্টিতে শৈব্যার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সমগ্র হৃদয় নয়নপথে বহির্গত হইয়া যেন শৈব্যাকে দৃঢ়বলে আপন হৃদয়াভ্যন্তরে ধরিয়া রাখিতে চাহিল।

সহসা বিশ্বামিত্রের তীব্র কণ্ঠে তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি আকুল হইয়া একবার শৈব্যার পানে ও একবার অস্তগামী লোহিত সূর্য্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

শৈব্যার হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিবার নহে। তাঁহার প্রাণে যে প্রবাহ ছুটিতেছিল, তাহার পরিমাণ একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও করিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি দেখিলেন যে সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন আর বিলম্ব নাই। তখন কি যেন এক ঐশী শক্তিতে হৃদয় বাঁধিয়া পতির চরণে শেষ প্রণাম পূর্ব্বক দাসের হাটের দিকে চলিলেন।

পত্নীর হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিয়া—স্তম্ভিত হরিশ্চন্দ্র, নির্ব্বাক—যন্ত্র পুত্তলির ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রোহিতাশ্ব দৌড়িয়া গিয়া মাতার অঞ্চল ধরিল।

শৈব্যার নয়নে অশ্রু নাই, বদনে কাতরতা নাই, হৃদয়ে চাঞ্চল্য নাই। সতী—স্বামীর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে চলিয়াছেন। তাঁহার সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শনে বিশ্বামিত্রও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

এক ব্রাহ্মণের নিকটে শৈব্যা পাঁচশত স্বুবর্ণ মুদ্রায় আত্ম-বিক্রয় করিয়া, স্বামীর অর্দ্ধেক ঋণ পরিশোধ করিলেন। কৃপণ ব্রাহ্মণ বিস্তর অর্থে দাসী ক্রয় করিল, তদুপরি সে আর তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না,—অনর্থক দুইজনের খোরাক জোগাইবে কেন?

শৈবা যখন বলিলেন, যে তিনি আপন অন্নের ভাগ হইতে পুত্রকে খাওয়াইবেন, তখন অগত্যা ব্রাহ্মণ সম্মত হইল। পুত্র কিছুতেই মাতাকে ছাড়িবে না। শৈব্যা তাহাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া স্বামীপদে বিদায় লইয়া গেলেন। তাঁহার শতধা বিদীর্ণ হৃদয়ে বুঝি পুত্রকে ধরিয়া, কতকটা জোড়া দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

রাজা রাণীর সে সময়ের মনোভাব ও হৃদয়ের অবস্থা একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। স্বয়ং মা বাণীও বুঝিবা তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন।

সেই দিন সেই অস্তগামী সূর্য্যের শেষ স্বর্ণ-রশ্মি-ছটা আকাশগাত্রে মিলাইতে না মিলাইতে রাজা হরিশ্চন্দ্রও এক চণ্ডালের নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিয়া বাকী পাচশত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। স্তম্ভিত বিশ্বামিত্রের মুখে আর বাক্য ছিল না। আকাশ হইতে দেবতারাও বুঝি অবাক হইয়া রাজারাণীর এই অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিতেছিলেন।

৯

পতী পত্নীর বিচ্ছেদ হইয়া গেল। অদৃষ্টলিপি পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হইল। সসাগরা ধরাধীপ রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া, বারাণসীর শ্মশানে মৃত কম্বলাহরণ করিতে লাগিলেন, আর রাজরাজেশ্বরী সহস্র কিঙ্করীর অধিশ্বরী শৈব্যা আত্মবিক্রয়ে দাসী হইয়া সপুত্রে পর-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। আর কি? সবইত ফুরাইল। ইহার উপরেও যদি আরও কোন পরীক্ষা থাকে—তবে তাহাতে বুঝিবা দেবতাও উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। বিশ্বামিত্র ঋষি হরিশ্চন্দ্রের অপূর্ব্ব ধর্ম্মবল ও শৈব্যার অলৌকিক পাতিব্রত্য দর্শনে নির্ব্বাক—স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু এ মহত্ত্বের শেষ দেখিবার আশায় তিনি তখন কিছু বলিলেন না—নীরবে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দিন যায়—থাকে না। যদি ইহাকে দিন যাওয়া বলে, তবে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যারও দিন যাইতে লাগিল। মাতা আপন অন্নের অংশ দিয়া পুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, নিজে প্রায় অনশন ও অর্দ্ধাশনে কাটাইতে লাগিলেন। ইহাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অচিরেই আর এক উপদ্রবে সতীকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল।

শৈব্যার প্রভুর এক গণ্ডমূর্খ পুত্র ছিল। সে পিতামাতার জল পিণ্ডস্থল একমাত্র সন্তান বলিয়া—তাহাদের বড় আদরের ধন ছিল। পিতামাতার অত্যধিক আদরে, সে মূর্খ, অসংযত, ভ্রষ্টচরিত্র ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কুক্ষণে সে তাহাদের নূতন দাসীর প্রতি সুনজরে চাহিল।

তাহার ধারণা ছিল—এ সংসারে কিছুই তাহার দুষ্প্রাপ্য নহে। বিশেষতঃ পিতামাতা যখন বলিত, যে তাহাদের যাহা কিছু সর্ব্বস্বই তাহার জন্য, তখন পুত্র অহঙ্কারে ধরাকে সরার ন্যায়ই দেখিত। তখন ব্যর্থ মনোসাধ বহন করিয়া, সে দুঃখময় জীবন যাপন করিবে কি জন্য ?

কিন্তু এবার তাহার চির-পোষিত দৃঢ় ধারণায় একটু সন্দেহের ছায়া পড়িল। সে যখন দেখিল, যে অন্যত্র ইচ্ছামাত্রেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও, গৃহে সামান্য ক্রীত-দাসীর নিকটে প্রাণপাত চেষ্টায়ও সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তখন রোহিতাশ্বকেই সে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিল, এবং তখন তাহার যত ক্রোধ, যত ক্ষোভ, যত আক্রোশ, সমস্তই পুঞ্জীভূত হইয়া বালকের উপরে গিয়া পড়িল। মূর্খের অন্যায় অত্যাচার ও প্রহারের তাড়নায় রোহিতাশ্ব অস্থির হইয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কছে ছুটিল।

বালকের নিরাপদ দুর্গ—মায়ের কোল। কিন্তু পুত্রকে সে দুর্গে আশ্রয় দিবার শক্তিও হতভাগিনী জননীর ছিল না। তিনি ক্রীতদাসী। ক্রীতদাসীর আপন দেহ ও শক্তিতেও নিজের অধিকার নাই। শৈব্যা আর কি করিবেন ? প্রহারিত পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া, রুদ্ধদ্বার কক্ষ মধ্যে গিয়া, অশ্রু মুছিতে মুছিতে দেবতাকে স্মরণ করিতেন।

মাতার সকাতর আহ্বান বুঝি দেবতার কর্ণে পৌঁছিল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। রোহিতাশ্বকে আর অধিকদিন সে উৎপীড়ন সে অত্যাচার সহ্য করিতে হইল না। কিন্তু সে সরল পথে নহে,—সে বড় বিপরীত—বড় ভীষণ ভাবে।

যদিও রোহিতাশ্ব তাহাদের ক্রীতদাস নহে এবং তাহাকে তাহাদের

ভরণপোষণ করিতে হইত না,—তবুও সে তাহাদের ক্রীতদাসীর পুত্র, এবং তাহারা অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিয়াছে বলিয়াই, সে মাতার সঙ্গে তাহাদের বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহাকেও ভৃত্যের ন্যায় খাটিতে হইত। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই, স্নেহময়ী মাতা, গোপনে পুত্রের কঠিন কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া রাখিতেন বলিয়া, বালক এতদিন কোন বিশেষ পরিশ্রমের কষ্ট পায় নাই। কর্ত্তা ও গৃহিণীর পূজার আয়োজন করিয়া দেওয়া এবং সেই পূজার জন্য প্রভাতে উঠিয়া ফুলতোলা রোহিতাশ্বের একটি নিত্যকার্য্য ছিল।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে মনিবপুত্রের নিকটে রোহিতাশ্ব অত্যন্ত প্রহারিত হইয়াছিল। মাতা পুত্রকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া সমস্ত রাত্রি সাশ্রুনয়নে দেবতার চরণে মনোবেদনা জানাইয়াছিলেন। প্রভাতে, প্রহারের ভয়ে কম্পিত কলেবরে, সাজি লইয়া রোহিতাশ্ব পুষ্পচয়নে বহির্গত হইয়া গেলে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাতা গৃহকর্ম্মসকল সম্পাদন করিতেছিলেন। সহসা রোহিতাশ্ব দৌড়িয়া আসিয়া মাতার চরণে লুটাইয়া পড়িল। মাতা, পুত্রকে প্রহারিত জ্ঞানে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে গিয়া সহসা চমকিয়া উঠিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে পুত্রকে ক্রোড়ে ধরিয়া—চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রোহিতাশ্বের সর্ব্বাঙ্গ দারুণ বিষে নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, মুখে ফেনোদ্গম হইতেছিল। হস্তাঙ্গুলির ব্যবধানে সর্পদংশনের ক্ষত হইতে রুধির নির্গমনের চিহ্ন শুকাইয়া গিয়াছিল। পুষ্পচয়ন করিতে রোহিতাশ্বকে কাল সর্পে দংশন করিয়াছিল।

দরিদ্র কৃতদাসীর পুত্রকে সর্পাঘাত হইয়াছে—তাহাতে কি যায়

আসে? নিত্য এমন কত হয়। সুতরাং কর্ত্তা গৃহিণীর তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কথা নহে। পাগলিনী মাতা—মৃতপুত্র ক্রোড়ে সারাদিন একাকিনী বসিয়া রহিলেন। কত লোককে কত মিনতি করিলেন, কতবার কর্ত্তা গৃহিণীর পদে ধরিলেন—যদি কেহ দয়া করিয়া কোন উপায় করিয়া দেয়? কিন্তু পুত্রহারা জননীর সকাতর সহস্র অশ্রু-সম্পাতেও, কাহারও পাষাণ হৃদয়ে একবিন্দু ধারা ফুটিল না,—অনাথা দরিদ্রের মর্ম্মব্যথায় কে সহানুভূতি প্রকাশ করে?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, কর্ত্তা গৃহিণী, পুত্রের সৎকার করিয়া আসিবার জন্য, কঠোরস্বরে দাসীকে অনুজ্ঞা করিলেন। ক্রীতদাসীর দেহ প্রাণ আপন আয়ত্তাধীন নহে,—হতভাগিনী শৈব্যা আজ রজনীর অন্ধকারে একাকিনী একমাত্র মৃতপুত্র ক্রোড়ে, পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বারাণসীর শ্মশানাভিমুখে চলিলেন।

সেদিন বড় দুর্য্যোগ। সমস্ত আকাশখানি কাল মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। রজনীর অন্ধকারের উপরে কৃষ্ণমেঘের ছায়া পড়িয়া অন্ধকারকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর, এবং সূচীভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিল। প্রবল পবনের সঘন নিঃশ্বাসে যেন কত বিভীষিকার কথা ছড়াইয়া দিতেছিল। ভীষণ বজ্রনাদে গৃহভিত্তিসমূহ আমূল কম্পিত হইয়া প্রলয়-কারী দেব অস্ত্রের অব্যর্থ সামর্থ্যের কতকটা আভাব দিতেছিল। তদুপরি মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎস্ফুরণে বিরাট কৃষ্ণ গগনাঙ্গনকে প্রলয়ের মহা-শ্মশানে পরিণত করিয়া, যেন একত্রে সহস্র সহস্র চুল্লী জ্বালাইয়া দিতেছিল। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া এক মহা প্রলয়ের ভীতিবিধায়ক অভিনয় চলিতেছিল।

সেই প্রলয়ের বিভীষিকার মধ্যে বারাণসীর মহাশ্মশান আরও বিকট আরও ভীষণ আরও বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ভীষণ মহাশ্মশানের বক্ষে, সূচীভেদ্য তমিস্রার মধ্যে, শত শত চুল্লী প্রজ্জ্বলিত হইয়া, যেন প্রেতকুলের সর্ব্বনাশী জ্বলন্ত অক্ষি-গোলক বিস্তারে চাহিতে-ছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃত-কঙ্কাল ও নরকপাল রাশি, বিদ্যুদ্দীপ্তিতে চকিতে উদ্ভাসিত হইয়া, প্রেতপুরীর সূচনা করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে পতিত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, অঙ্গাররাশি, ও ছিন্নবস্ত্র সকল পরিত্যক্ত প্রেত ভূমিকে মহা বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল।

আকাশে—প্রকৃতির মহা শ্মশানপটে—যেমন প্রেতকুলের তাণ্ডব নর্ত্তন চলিতেছিল, নিম্নেও বারাণসীর মহাশ্মশানবক্ষে, সেই দুর্য্যোগ রজনীতে, তেমনি মূর্ত্তিমান জীবন্ত বিভীষিকার ভৈরব হুঙ্কার ছুটিতেছিল। উপরে

ও নীচে ভুই মহাশ্মশান একত্রে মিলিয়া প্রকৃতিকে সে রজনীতে প্রলয়ঙ্করী-বেশে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল।

সেই মহাপ্রকৃতি-বিপ্লবের মধ্যে—সেই বিভীষিকাময়ী মহাশ্মশানের বক্ষে—সেই মসীমাখা ভীষণ অন্ধকারের ক্রোড়ে চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র একাকী—মহাপ্রেতের ন্যায়—ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন।

তাঁহার চক্ষে অশ্রু ছিল না—হৃদয়ে ভয় ছিল না—শরীরে কম্পন ছিলনা। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া, তাঁহার অন্তরনিহিত গভীর বেদনারাশি প্রকাশ করিয়া দিতেছিল মাত্র। তাঁহার আকৃতিতে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, যে, যে কেহ তাঁহাকে দেখিলে, চণ্ডাল ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না।

সহসা হরিশ্চন্দ্রের কর্ণে হৃদয়ভেদী মহাকাতর বামাকণ্ঠের রোদনধ্বনি পৌঁছিল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক—মরুভূমির মত হইয়া গিয়াছিল। সে হৃদয়ে আর স্নেহ ছিল না—দয়া ছিল না—মায়া ছিল না—মমতা ছিল না সহানুভূতি ছিল না। প্রেম, প্রণয়, ভক্তি ভালবাসা কিছুই ছিল না। সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছিল। আর পতিহারা কাঙ্গালিনী বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিলে, সে হৃদয় ব্যথিত হইত না। আর সন্তানহারা জনকজননীর হৃদয়ভেদী রোদনরোলেও তাঁহার নয়নে, একবিন্দু জলসঞ্চার হইত না। তিনি মানুষ,—তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না। যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার মত নীরবে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতেন। কেবল মাঝে মাঝে এক তীব্র হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার মানব-হৃদয়ের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দিত

আজ কিন্তু তাঁহার এ স্বভাবে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইল। এই বামাকণ্ঠ নিঃসৃত রোদনধ্বনিতে তাঁহার হৃদয় সহসা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কারণ বুঝিতে পারিলেন না। নীরবে তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

রমণী যখন একাকিনী তাহার মৃত পুত্র ক্রোড়ে, সেই প্রলয়ের রজনীতে, সেই ভীষণ শ্মশানভূমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন চণ্ডাল বেশধারী হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এ রমণী কি তবে নিতান্তই অনাথা? তাহার কি আর কেহই নাই? নহিলে এ অবস্থায় এ শ্মশানে একাকিনী কেন? একি?—তাঁহার অন্তর সহসা এ দৃশ্যে আজ কম্পিত হইতেছে কেন? পূর্ব্বজীবনের নিভ-নিভ বহুদিন বিস্মৃত অতি ক্ষীণ স্মৃতির ন্যায়, কি যেন একটা অস্ফুট মর্ম্মকথা চকিতে একবার তাঁহার মনে উদয় হইয়া, একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সহিত শ্মশানের অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গেল।

তিনি যখন পরিচয়ে শুনিলেন যে রমণী ক্ষত্রিয় গৃহিণী—পুত্র ক্ষত্রিয়-পুত্র, তখন আরও, বিস্মিত হইলেন। কে জানে কেন রমণীর প্রতি আপনা হইতেই তাঁহার প্রাণে এক প্রবল সহানুভূতি জাগিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—সৎকারের পাঁচপণ কড়ি রাখিয়া রমণী চলিয়া যাউন, তিনি তাঁহার পুত্রের সৎকার সমাধা করিয়া দিবেন। হতভাগিনী রমণীকে আর তাহা স্বচক্ষে দেখিতে হইবে না।

কিন্তু হায়—পাঁচটা কাণাকড়ি যাহার সম্বল নাই—সে পাঁচপণ কড়ি কোথায় পাইবে? পুত্র সর্পাঘাতে মৃত, রমণী পাগলিনী হইয়া তাহাকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তিনি ক্রীতদাসী—নিজ দেহ প্রাণের

উপর তাঁহার নিজের অধিকার ছিল না। তাঁহার প্রভু যখন পুত্রের সংকারের আদেশ করিল—তখন তিনি বাধ্য হইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া পুত্র লইয়া একাকিনী এ শ্মশানে আসিয়াছেন। কিন্তু—ঐ পর্য্যন্ত। শ্মশানে আসিয়া কি করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না—আরত কখনও আসেন নাই। পাচপণ কড়ি কোথায় পাইবেন ?

রাজরাজেশ্বরী আজ একাকিনী মৃতপুত্র ক্রোড়ে—শ্মশানে। তাও—পাচপণ কড়ির অভাবে পুত্রের সংকারে বঞ্চিতা—হায় নিষ্ঠুর ভবিতব্য !

হরিশ্চন্দ্র আরও চমৎকৃত হইয়া গেলেন। কে এ রমণী, তবে কি বিধবা অনাথা হইয়া ক্রীত-দাসী হইয়াছে ? এ কথার উত্তরে রমণী আরও ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এ চণ্ডাল বলে কি ? তাঁহার ত সকলি গিয়াছে—কেবল অতি কষ্টে সিঁথির সিন্দুরটুকু বজায় আছে। এ শেলের উপরে আবার শেল হানিতে চাহে—চণ্ডাল না জানিয়া বলে কি ? হরিশ্চন্দ্র একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

এ তবে কে ? ক্ষত্রিয় নারী—ক্ষত্রিয় সন্তান ? পতি বিদ্যমানে হতভাগিনী ক্রীতদাসী—অনাথা ? জগতে তাঁহার ন্যায় আরও স্ত্রীপুত্র বিক্রয়কারী মহাপুরুষ আছে নাকি ? হরিশ্চন্দ্র নিতান্ত মিনতি সহকারে তখন রমণীকে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এ রমণীর পতি আছে—তবে আজ সে কোথায় ? পুত্র মৃত—পত্নী অনাথা পাগলিনী—সে কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে ? কেমন সে পাষাণ হৃদয়—এখনও এ শ্মশানে ছুটিয়া আসিয়া পড়িতেছে না ?

এবার ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় রমণী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহারই মুখের উপর—তিনি জীবিত থাকিতে—এ চণ্ডাল তাঁহার স্বামীর নিন্দা করিতে

সাহস পাইল ? হায়, সতীর প্রাণে স্বামী নিন্দায় যে শেল বিদ্ধ হয়—পুত্রশোকও বুঝি তাহার নিকটে তুচ্ছ ! তিনি অতর্কিতে কাঁপিতে কাঁপিতে —ক্রন্দন মিশ্রিত ক্রুদ্ধস্বরে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—'চণ্ডাল, অমন কথা আর দ্বিতীয়বার যেন মুখে না আনে। সে জানে না, যে কাহাকে কি বলিতেছে ! সে জানে না যে তাঁহার—রাজ-রাজেশ্বর—চিরকরুণার আধার —দয়ার সাগর পতির নিন্দা করিতেছে।

এঁ্যা—রাজ রাজেশ্বর ? পাগলিনী বলে কি ? তবে কি এ জগতে আরও হরিশ্চন্দ্র, আরও শৈব্যা আছে নাকি ? হরিশ্চন্দ্র আরও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে একবার বিদ্যুৎ খেলিল। হরিশ্চন্দ্র একবার ভাল করিয়া রমণীর মুখ দেখিলেন। তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ-ধারা ছুটিল—এঁ্যা এ কে ? বুঝি একটা বড় পরিচিত মুখের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

তখন উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় হরিশ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তবে কে ? তুমিই কি শৈব্যা ? ওই কি রোহিতাশ্ব ? সেই সময়ে আর একবার বিদ্যুৎ বিকাশ পাইল। চণ্ডালের ভাব দেখিয়া শৈব্যাও চমৎকৃত হইয়া গিয়া-ছিলেন। এবার বিদ্যুতালোকে শৈব্যা চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রকে স্পষ্টরূপে চিনিলেন। "মহারাজ, আমার হৃদয়েশ্বর, ওই তোমার গচ্ছিত রত্ন লও—পুত্র ক্রোড়ে কর" বলিতে বলিতে শৈব্যা পতির হৃদয়ের উপর পতিতা হইয়া মূৰ্চ্ছিতা হইলেন। উন্মাদ হরিশ্চন্দ্রও বহুদিনের পরে পত্নীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া—জ্ঞান হারাইলেন। কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ—উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া রহিলেন।

যখন তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল—তখন উষার প্রথম ছটায় দিঙ্মণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা সাশ্চর্য্যে দেখিলেন —সহাস্য প্রফুল্ল বদনে ঋষিপ্রবর বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

রাজা তখন বিশ্বামিত্রের চরণে পতিত হইয়া আত্মকাহিনী বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বিশ্বামিত্র মৃত সঞ্জিবনী দানে রোহিতাশ্বকে বাঁচাইলেন। তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। তিনি শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্রের অলৌকিক পাতিব্রত্য ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মবল দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

রোহিতাশ্বের জীবন দান করিয়া, বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সকলকে সম-ভিব্যাহারে লইয়া গিয়া—আবার হরিশ্চন্দ্রকে অযোধ্যার রাজাসনে বসাইলেন, এবং আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিয়া, আপন তপশ্চর্য্যায় প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বামিত্র রাজ্য পাইয়াও রাজ্যেশ্বর হন নাই। শৈব্যার পাতিব্রত্য ও হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মবল পরীক্ষার্থে—এতদিন কোনমতে, ধার্ম্মিকের গচ্ছিত রাজ্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন মাত্র।



সাবিত্রী।

১

দান-ধ্যান, ব্রত-উপবাস, পূজা-অর্চ্চনা করিয়াও যখন মদ্ররাজ অশ্বপতি ও রাণী মালবীর দুরদৃষ্টের খণ্ডন হইল না—তাঁহারা পূর্ব্বের মতই—সন্তান লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিলেন, তখন—শুধু রাজদম্পতি কেন—দেশশুদ্ধ প্রজামণ্ডলীও নৈরাশ্যের অকুল-সাগরে ভাসিল। সকলেরই মনে কেবল এই একটা বিষম চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল যে, রাজার অবর্ত্তমানে এ রাজ্যের দশা হইবে কি ?

তখন—সত্যযুগ, রাজার সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে প্রজাদেরও সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল জড়িত থাকিত। রাজারা যেমন সন্তান-জ্ঞানে প্রজাদের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও সুখ-সৌভাগ্য বর্দ্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, প্রজারাও তেমনি মা-বাপের মত তাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইত, তাঁহাদের আবশ্যকে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া দিতেও পিছাইত না। তাই রাজগৃহে একটি বংশধরের শুভাগমন কামনা করিয়া দেশশুদ্ধ প্রজারাও ঘরে ঘরে পূজা-অর্চ্চনা, দান-ধ্যান, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ঘটা লাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হইল না। রাজ্যশুদ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জের সমস্ত ইচ্ছা-শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া, ভাগ্যবিধাতা রাজারাণীর উপর বিমুখ হইয়াই রহিলেন।

রাজরাণীরও বয়স হইয়াছিল, সুতরাং পুত্র লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা রাজ্যের ভবিষ্যতের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন, তবুও কোন দিকে কোন উপায় ঠাহর করিতে পারিলেন না। তখন অশ্বপতি একদিন এক বিরাট সভা করিয়া রাজ্যের সমস্ত লোককে আহ্বান করিলেন এবং তপোবনবাসী ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিগণকে আনাইয়া—রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য—যুক্তি ও কর্ত্তব্য স্থির করিতে বসিলেন।

তখন ভারতের নানাস্থানে মুনিঋষিদের বহু তপোবন ছিল। সেই সকল তপোবনের পর্ণকুটীরে বসিয়া তপস্যার প্রভাবে মুনিঋষিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সকল কথা জানিতে পারিতেন এবং লোকের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য—দেবতাদের পর্য্যন্ত নাকানি-চোবানি খাওয়াইয়া—অসাধ্য-সাধন করিতেন। রাজারা—প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবিয়া—তাঁহাদিগের অনুগত হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহাদের আদেশ না লইয়া কোন কাজে এক পা অগ্রসর হইতেন না।

সভামণ্ডপে সমবেত প্রজাপুঞ্জ ও মুনিঋষিগণের নিকটে রাজা অশ্বপতি যখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে—তাঁহার অবর্ত্তমানে মদ্রদেশের রাজ্যভার লইবে কে, তখন সভাস্থ সকল লোকেরাই নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল—কেহই কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। কেবল জন দুই-তিন ত্রিকালজ্ঞ মুনি আশ্চর্য্য-ভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া কহিলেন—

"এমন কথা কেন বলিতেছেন মহারাজ, আপনার ভাগ্যে বংশ-মান উজ্জ্বলকারী পরম সুসন্তান রহিয়াছে যে?"

সভাশুদ্ধ লোক অবাক হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিল, রাজা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"তার আর সম্ভাবনা কই ঠাকুর? আমাদের যে বানপ্রস্থ লইবার সময় কাছাইয়া আসিতেছে! এত বার-ব্রত, পূজা—অর্চ্চনা করিলাম, কিছুতেই তো ভাগ্যবিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন না?"

"নিশ্চয় সদয় হইয়া ভাগ্যবিধাতা সুফল দান করিবেন। আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার তপস্যা করুন, তিনি সন্তুষ্ট হইলে সন্তান-প্রদানকারী দেবী সাবিত্রী বিমুখ হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আপনি সুসন্তান লাভ করিবেন, আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি।"

মুনিঋষিগণের আশ্বাস বাক্যে রাজা-প্রজা সকলেরই প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইল। রাজা আর কালবিলম্ব না করিয়া—মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়া—তপস্যায় গমন করিলেন।

ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া অশ্বপতির মহা কঠোর ঐকান্তিক তপস্যার ফলে সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহারই আদেশে যজ্ঞকুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্য হইতে সাবিত্রী দেবী আবির্ভূত হইয়া বর দিলেন—

"যাও রাজা, তোমার এক অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী কন্যা লাভ হইবে—এই কন্যা হইতেই তোমার শত পুত্রের কার্য্য হইবে।"

যথা সময়ে সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। সাবিত্রীদেবীর বরে জন্মিয়াছে বলিয়া—মেয়ের নাম হইল—**সাবিত্রী**।

২

সাবিত্রী যতই বাড়িতে লাগিলেন ততই তাঁহার আশ্চর্য্য রূপ দিন দিন যেন অধিকতর ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, যে দেখিল সেই শুধু যে অবাক হইয়া গেল এমন নয়, মনে মনে ভাবিল—এমন রূপ তো মানুষের দেখা যায় না, এ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শিশু পাইল কোথায় ? তবে কি কোন দেবী শাপভ্রষ্ট হইয়া রাজগৃহে আসিয়া জন্মিয়াছেন ?

লোকের মনের কথা চাপা থাকিল না—অতি সত্বর দেশরাষ্ট্র হইয়া গেল। মদ্ররাজ্যের চারিদিক হইতে দলে দলে প্রজারা নিত্য আসিয়া সাবিত্রীকে দেখিয়া যাইতে লাগিল এবং সকলেরই মনে এই কথাটাই নিরন্তর জাগিতে থাকিল যে—রাজার কঠোর তপস্যার ফলে স্বয়ং সাবিত্রী দেবী যখন যজ্ঞকুণ্ড হইতে উঠিয়া বর দিয়াছেন, তখন এই মেয়ে কখনই সাধারণ হইবে না, তাহার অপরূপ রূপই সে কথার প্রমাণ দিতেছে। সুতরাং প্রজাবৃন্দেরও আর আনন্দ রাখিবার জায়গা থাকিল না, রাজ-কন্যার কল্যাণ কামনা করিয়া সকলেই ঘরে ঘরে পূজা-অর্চ্চনা, দান-ধ্যান ও আমোদ-উৎসবের ধূম লাগাইয়া দিল।

এদিকে সাবিত্রী যতই বড় হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আশ্চর্য্য রূপের মত নানা আশ্চর্য্য গুণ ও শক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তার উপর রাজারাণী আবার যখন কন্যার সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তখন সোণায় সোহাগা মিলিল। দেখিতে দেখিতে—অতি অল্পকালের ভিতরেই—আশ্চর্য্য প্রতিভা-বলে সাবিত্রী সর্ব্ববিদ্যাতেই এমন সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন যে লোকে তাঁহার শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া

গেল। বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার বিদ্যা, জ্ঞান ও সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার দেখিয়া যেমন নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন, তেমনি অন্য দিকে আবার পাকা গৃহিণীর দল সাবিত্রীর সকল গৃহকর্ম্মেই অদ্ভুত রকমের দক্ষতা দেখিয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া পড়িল। তার উপর সাবিত্রীর ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগ এবং সর্ব্বদাই পূজা-অর্চ্চনা, বার-ব্রত, দান-ধ্যান ও তপস্যার অনুষ্ঠান প্রভৃতি দেখিয়া মুনিঋষিরা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে 'ধন্য ধন্য' করিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ফলে হইল এই—সাবিত্রীর অপরূপ রূপের সঙ্গে সেই সকল অদ্ভুত প্রতিভা মিশিয়া তাঁহাকে সকলের কাছেই শুধু যে দেবীর মত বরণীয় করিয়া তুলিল এমন নয়, তাঁহার রূপ-লাবণ্যে দেবী-ভাব জড়িত হইয়া ঠিক দেবীর মতই অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিল। কিন্তু এই ব্যাপার রাজারাণীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীর সুখের ও গর্ব্বের কারণ হইলেও, অন্যদিকে আর একটা সাংঘাতিক অনিষ্ট পাতের সূচনা করিয়া দিল।

সাবিত্রীর বিবাহের বয়স হইলে রাজা পাত্র অন্বেষণের জন্য চারিদিকে ভাট পাঠাইলেন। ভাটেরাও রূপে-গুণে-কুলে-শীলে সাবিত্রীর যোগ্য বহু পাত্র আনিতে লাগিল। কিন্তু যে আসিয়া সাবিত্রীকে দেখিল, তাহারই মনে পত্নীভাবের পরিবর্ত্তে মাতৃভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহারা তাঁহাকে 'মাতৃ-সম্বোধন' করিয়া বিদায় হইতে লাগিল। ক্রমে এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, তখন কোথাও আর পাত্র মিলিল না—সাবিত্রী কুমারী হইয়াই রহিলেন।

রাজারাণী বিষম ভাবনায় পড়িলেন, বিজ্ঞ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া মেয়ের স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সে স্বয়ম্বর-সভা শূন্য

পড়িয়া রহিল—সাবিত্রীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় একটা প্রাণীও আসিল না। তখন রাজারাণীর চক্ষু কপালে উঠিল। লোকের কত কুরূপ কুৎসিত, দুর্মুখ, কাঁণা, খোঁড়া মেয়েরও বিবাহ হইতেছে, আর তাঁহাদের নয়ন-পুতলি গর্ব্বের ধন সাবিত্রীর বিবাহ হইবে না!

এদিকে সাবিত্রীর বয়সও দিন দিন বাড়িয়া তাঁহার কুমারীকাল কাটিয়া যৌবন সমাগমের সূচনা দেখা দিল। ক্রমে এমন হইল যে আর একটা দিনও কুমারী অবস্থায় রাখিলে চলে না, অথচ পাত্রও মিলে না, কাহার সহিত বিবাহ হইবে? রাজার কুল, মান, গর্ব্ব এমন কি ধর্ম্ম কর্ম্ম পর্য্যন্ত পণ্ড হইতে চলিল! উপায় কি?

রাজা বিস্তর যুক্তি পরামর্শ করিয়া সাবিত্রীকে নিজের বর নিজে খুঁজিয়া আনিবার জন্য তীর্থভ্রমণে পাঠাইলেন। বিস্তর লোকজন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া সাবিত্রী ভারতবর্ষের নানা তীর্থ—নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৩

পূর্ব্ব হইতেই দেশ-দেশান্তরে রটিয়া গিয়াছিল যে মদ্ররাজ-কুমারী মানুষ নহেন—শাপভ্রষ্টা দেবী। সুতরাং সাবিত্রীর রথ যখন যে দেশের ভিতর দিয়া চলিল, তখন সেই স্থানের আবালবৃদ্ধবনিতা দেবী দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চারিদিকে জড় হইতে লাগিল। সাবিত্রী সকলকেই যথাযোগ্য মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া সে স্থান পার হইয়া যাইতে লাগিলেন। সাবিত্রীর রূপে ও মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতি যেমন আকৃষ্ট হইতে লাগিল তেমনি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"অচিরে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক!"

এইরূপে দেশ-দেশান্তরের নরনারীর ঐকান্তিক মঙ্গল কামনায় মণ্ডিত হইয়া সাবিত্রী একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ভারতের বড় বড় নগর, গ্রাম এবং সমস্ত তীর্থগুলি ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার অভিপ্রেত বস্তু মিলিল না। এদিকে গৃহের বাহিরে মুক্ত প্রকৃতির বক্ষে নানাপ্রকার দৃশ্যের ভিতরে ভ্রমণ করিতে করিতে সাবিত্রীর বহু জ্ঞান—বহু অভিজ্ঞতা—জন্মিল। আর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতে থাকিল, ততই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব দিন দিন অধিকতর প্রবল হইয়া ঈশ্বরে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যেমন অটল হইতে চলিল তেমনি মনের বলও শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

তিনি ভারতের নানা দেশ, গ্রাম, নগর ও তীর্থস্থানগুলি দেখিলেন —বাকী রহিল শুধু মুনিঋষিদের তপোবন দর্শন। তাঁহার মন ক্রমাগত সেই দিকে টানিতেছিল, শেষে তিনি আর থাকিতে না পারিয়া তপোবনের

অভিমুখে রথ চালাইবার আদেশ দিলেন। সঙ্গে যে সকল অমাত্য ও লোকজন ছিল, সকলেই মনে মনে আশ্চর্য্যজ্ঞান করিল—এত বড় বড় নগরে ও রাজধানীতে যে রাজকুমারীর পাত্র মিলিল না, তাঁর বর কি তপোবনে ফলমূলাহারী ঋষি তপস্বীগণের ভিতরে মিলিবে? কিন্তু তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে কেহই সাহস করিল না। তপোবনের দিকে রথ চালাইয়া দিল।

ভারতের তপোবন—সে এক পরম পবিত্র, শান্তিময় স্বপ্নাতীত ব্যাপার! রিপুর বশীভূত, স্বার্থপর, অজ্ঞান মানুষ আমরা—সে মহান, স্বর্গীয় ব্যাপারের ধারণাও করিতে পারি না। সেখানে বাঘ হরিণের গা চাটিয়া দিত, পাখী বিড়ালের সঙ্গে খেলা করিত, সাপের মাথায় চড়িয়া ভেক আনন্দে নৃত্য করিত! পাপ-তাপপূর্ণ সংসারের কলুষিত বাতাস তাহার ধারেও ঘেঁসিতে পারিত না। হিংস্র পশুরা পর্য্যন্ত খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া, পরস্পরে প্রেমের বন্ধন পরিয়া ভাই-ভাইয়ের মত একসঙ্গে মনের আনন্দে কালযাপন করিত। আর সেই সকল তপোবনে জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে বাস করিয়া মুনি, মুনিপত্নী, মুনিকন্যা ও মুনিবালকগণ স্বর্গবাসও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

সেই সকল তপোবনে মুনিগণের আশ্রমে আশ্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে সাবিত্রীরও মনে বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। রাজধানী, রাজগৃহ ও রাজ-ভোগের প্রতি বিরাগ জন্মিল, মন শান্তিতে পূর্ণ ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসে অটল হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মনে—তেমনি তপোবনে, তপস্বী তপস্বিনীগণের সহিত বাস করিবার জন্য—প্রবল আগ্রহ জন্মিল, এবং আরও একটা বিশ্বাসও গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল



—যে এই তপোবনেই, কোথাও না কোথাও, তাঁহার ইষ্ট বস্তু লাভ হইবে।

তেমনি মনের ভাব লইয়া সাবিত্রী এক তপোবন হইতে অন্য তপোবনে চলিলেন। তিনি যখন যেখানে যাইতে লাগিলেন সেই আশ্রমের মুনি, মুনিপত্নী, মুনিবালক ও মুনিকন্যাগণই তাঁহাকে এমন যত্ন-সমাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন যে সাবিত্রীর মনে হইল—এই তপস্বী-মণ্ডলী তাঁহার নিতান্তই আপনার জন! আর ততই তপোবনবাসিনী হইয়া—তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এমনি নানা মুনির আশ্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে সাবিত্রী আর এক তপোবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তপোবনে 'মাণ্ডব্য' প্রভৃতি বিখ্যাত মুনিগণের আশ্রম ছিল, এবং এক প্রান্তে 'শাল' দেশের রাজ্যচ্যুত অন্ধ রাজা 'দ্যুমৎসেন' তাঁহার পত্নী ও একমাত্র পুত্র 'সত্যবানকে' লইয়া তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

সাবিত্রী এই তপোবনে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে অতিথি হইলেন এবং সত্যবানকে প্রথম দর্শনেই—আপনার ইষ্টদেব বলিয়া—মনে মনে বরণ করিয়া লইলেন। তারপরে সেখান হইতে বিদায় হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। কেহ কিছু জানিল না—বুঝিল না, সঙ্গের লোকজন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া—দেশের দিকে রথ চালাইয়া দিল।

৪

সাবিত্রী তীর্থভ্রমণ করিয়া যখন মদ্র-রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বিদ্যুৎবেগে সহরময় তাঁহার প্রত্যাগমনের সংবাদ রটিয়া গেল। ঘটনাচক্রে রাজা অশ্বপতি তখন রাজসভায় বসিয়া দেবর্ষি নারদের সঙ্গে কন্যার বিবাহের কথাই আলোচনা করিতেছিলেন। না জানি সাবিত্রী কি করিয়া আসিলেন ভাবিয়া, উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাড়াতাড়ি তিনি লোক পাঠাইয়া কন্যাকে রাজসভায় আনাইলেন। সাবিত্রী, পিতা, গুরুজনবর্গ এবং দেবর্ষির পদ বন্দনা করিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। রাজা অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মা এই দেবর্ষির সঙ্গে এতক্ষণ তোমার কথাই হইতেছিল। কি করিয়া আসিলে বল, আমরা সকলেই উৎকণ্ঠায় অধীর হইতেছি।"

সাবিত্রী দেখিলেন যে এস্থলে রমণীসুলভ লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া কথা গোপন করিলে কার্য্যহানি হইতে পারে। তিনি অশেষ বুদ্ধিমতী—সকল শাস্ত্রে পারদর্শিনী—স্থির, ধীর, গম্ভীরপ্রকৃতি! নতমস্তকে, সলজ্জভাবে অথচ দৃঢ় গম্ভীর স্বরে এক এক করিয়া নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল কহিয়া শেষে বলিলেন—

"আমি সেই তপোবনে অন্ধ রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের একমাত্র পুত্র সত্যবানকে পতিরূপে নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়াছি।"

শালদেশের রাজা পীড়ায় চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইলে, তাঁহার শত্রুরা—

সুযোগ বুঝিয়া—তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল। সত্যবান তখন বালক মাত্র। দ্যুমৎসেন নিরুপায় হইয়া রাজরাণী শৈব্যা ও পুত্র সত্যবানকে লইয়া—তপোবনে চলিয়া গিয়া—তপস্বী-জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশের লোকেরাই শুনিয়াছিল। সুতরাং সাবিত্রীর কথা শুনিয়া মদ্ররাজ আশ্বস্ত হইলেন।

মেয়ের বিবাহ লইয়া যে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যে কোন ব্যক্তির করে সাবিত্রীকে সমর্পণ করিতে পারিলেই অশ্বপতি রক্ষা পাইতেন। তেমন অবস্থায় সাবিত্রী যে—মান-মর্য্যাদায়, কুলে-শীলে—সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সমকক্ষ ঘর হইতে বর বাছিয়া লইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কেবল একমাত্র কথা যে,—দ্যুমৎসেন রাজ্যচ্যুত, অর্থ, সামর্থ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু ক্ষতি কি তাহাতে? সাবিত্রী যে তাঁর একমাত্র সন্তান! তাঁর নিজের রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্তেরই অধিকারিণী! তবে আর জামাতা দরিদ্র বলিয়া চিন্তা কি? অশ্বপতি আনন্দে অধীর হইয়া দেবর্ষির অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন।

নারদঋষি কিন্তু সেই কথা শুনিয়া অবধি গম্ভীর হইয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। অশ্বপতির কথায় জবাব করিলেন—

"হ্যাঁ মহারাজ, সাবিত্রী সর্ব্বাংশেই তাহার উপযুক্ত পাত্রকে মনোনীত করিয়া আসিয়াছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সত্যবানের মত কুলে শীলে, জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে, ধর্ম্মে, চরিত্রে—সর্ব্ববিষয়েই উপযুক্ত সুপাত্র আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু এক মহা দোষে সে সকল গুণ তার নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সত্যবান অত্যন্ত অল্পায়ু। ঠিক এক বৎসর পরে অমাবস্যার রাত্রে তাহার মৃত্যু হইবে!"

সেই মুহূর্ত্তে রাজসভায় বজ্রপাত হইলেও বোধ করি কেহই এত চমকিত হইত না। দেবর্ষির কথায় সকলেরই বুক দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সকলের মুখ হইতেই আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত উড়িয়া গেল। রাজা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

"মা, স্বকর্ণে দেবর্ষির কথা শুনিলে তো? সত্যবানের সঙ্গে আর কিছুতেই তোমার বিবাহ দিতে পারি না, তুমি অন্য পাত্র মনোনীত কর।"

সাবিত্রী কিন্তু অচল অটল গম্ভীর! ধীরে ধীরে, দৃঢ়স্বরে বলিলেন—

"তা হইতে পারে না মহারাজ! লোকে বিষয় ভাগ করিবার ঘুঁটী একবারই নিক্ষেপ করে এবং 'দিলাম' এই কথাটা একবারই বলিতে পারে, এ সব কাজ আর দ্বিতীয়বার হইবার নয়। সুতরাং আমি যখন সত্যবানকে একবার আত্মসমর্পণ করিয়াছি তখন আর কিছুতেই ফিরাইয়া লইতে পারিব না। আরও দেখুন, মনেই প্রথমে কর্ম্মের সূচনা হয়, তারপরে লোকে কথায় তা প্রকাশ করে এবং শেষে তা কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন করে। আমি যখন মনে মনে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি—তখনই তো সে কার্য্যের সূচনা হইয়া গিয়াছে, এখন আবার অন্যজনকে বরণ করিয়া নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পরিব না। সত্যবান স্বল্পায়ু হোন কি দীর্ঘায়ু হোন—কিছু যায় আসে না, তিনিই আমার পতি। আমাকে আর অন্যায় অনুরোধ করিবেন না।"

পরম ধার্ম্মিক রাজা অশ্বপতি এ কথার উপরে আর কথা কহিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে নারদের পানে চাহিলেন। সাবিত্রীর

ধর্ম্মজ্ঞান ও মনের দৃঢ়তা দেখিয়া দেবর্ষি মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন, আশ্বাস দিয়া কহিলেন—

"ভয় নাই মহারাজ, এমন ধার্ম্মিক ও পতিব্রতা রমণীর কখনই অমঙ্গল ঘটিবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে সত্যবানের করে সাবিত্রীকে অর্পণ করুন। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—মা আমার সকল অমঙ্গল দূরীভূত করিয়া জগতে সতীধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিবেন।"

নারদ বিদায় হইলেন, অশ্বপতি ভাবিলেন যে—দ্যুমৎসেন এক্ষণে রাজ্যচ্যুত ভিক্ষুক, সুতরাং পুত্রের বিবাহে সমারোহ করিতে পারিবেন না, বরং তিনি সমারোহ করিলে সেই অন্ধ নৃপতির মনে দারুণ আঘাতই লাগিবে। এই ভাবিয়া তিনি সাবিত্রীকে লইয়া—নিজে উপযাচক হইয়া—সেই তপোবনে গমন করিলেন, এবং শুভদিনে—শুভলগ্নে সত্য-বানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দিয়া রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু তিনি সমারোহ না করিলে হইবে কি, দেশশুদ্ধ প্রজারা আপনা হইতেই তাঁহাদের পিছনে পিছনে সেই তপোবনে গিয়া—নাচ-গান আনন্দ উৎসবের ধূম করিয়া ফিরিয়া আসিল। সেই তপোবনের ভিতরে যে সমারোহের ঘটা ঘটিয়া গেল, রাজধানীতে বিবাহ হইলে, তেমন ঘটিত কি না সন্দেহ!

৫

অশ্বপতি কন্যার বিবাহে বিস্তর গহনাগাঁটী এবং যৌতুক দিয়া গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বিদায় হইবার পরেই সাবিত্রী সে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া—আয়তির চিহ্নস্বরূপ—হাতে কেবল মাত্র তু'গাছি শাখা ও লোহা রাখিলেন এবং মূল্যবান বসন পরিত্যাগ করিয়া বল্কল-বসনে দেহ আবৃত করিলেন। তাঁহার স্বামী ও শ্বশুর সন্ন্যাসী, শাশুড়ী সন্ন্যাসিনী! বধূ হইয়া তিনি কি অন্যরূপ আচরণ করিতে পারেন?

তাঁহার সেই—নবীন সন্ন্যাসিনীর বেশ দেখিয়া—শাশুড়ীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"মাগো, তোমার এ বেশ যে চোখে দেখিতে পারি না, রাজকন্যা তুমি—এই ভিখারীর ঘরে আসিয়া কত তুঃখ পাইবে! তোমার পিতার দেওয়া কাপড় গহনা ছাড়িও না মা।"

কিন্তু সাবিত্রী মধুর হাসিতে শাশুড়ীর মন ভুলাইয়া জবাব করিলেন—

"মাগো, মেয়ে-মানুষের যা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, সেই স্বামীরত্ন যেন চিরদিন গলায় পরিয়া থাকিতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

শাশুড়ীর মুখে আর কথা সরিল না, বধূর গৌরবে মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল: তিনি অন্ধ রাজার কাছে গিয়া যখন সেই কথা জানাইলেন তখন তাঁহার অন্ধ চোখ তুটী ছাপাইয়া জল বহিল, তুইজনে ঐকান্তিক প্রাণে বধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিলেন।

বধূ হইয়াই সাবিত্রীর যেন পুনর্জ্জন্ম ও নবজীবন লাভ হইল। তিনি যে অত বড় রাজার একমাত্র আদরিণী মেয়ে—এ কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। যেন দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়া চিরদিনই এমনি দরিদ্রতার ভিতরে প্রতিপালিত হইয়াছেন—এমনি ভাবে মন প্রাণ ঢালিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর ও স্বামীর সেবা ও সমস্ত গৃহকর্ম্মগুলি নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যকারিতা দেখিয়া শুধু যে তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ হৃদয়ে 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন এমন নয়, তাঁহার শাশুড়ী ও স্বামীর নিজেদের করিবার জন্য আর কোন কাজ বাকী পড়িয়া থাকিল না। এই সব গৃহকর্ম্ম একাকী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও সাবিত্রী সেই তপোবনবাসী সমস্ত মুনিগণের আশ্রমে আশ্রমে ফিরিয়া সকলের সংবাদ লইয়া সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইলেন। তাহার ফলে সাবিত্রী সেই তপোবনবাসী সমস্ত মুনি, মুনিপত্নী, মুনিকন্যা, মুনিবালক—এমন কি পশুপক্ষীগুলির পর্য্যন্ত নিতান্ত আপনার জন হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসিতে—বেশী যত্ন আদর করিতে লাগিল। সাবিত্রী সেই সমস্ত তপোবনবাসী ও বাসিনীগণের প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু একটা কথা সাবিত্রী কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। নারদ ঋষির সেই ভবিষ্যৎবাণী তাঁহার অন্তরে অন্তরে দিবানিশি আগ্নেয় অক্ষরে জ্বলিতেছিল। 'এক বৎসর পরে অমাবস্যার রাত্রে সত্যবানের মৃত্যু হইবে! এই কথাটা সাবিত্রীর বুকে পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া যেন তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষির আশীর্ব্বাদের কথাও মনে পড়িল—'এমন সতীর কখনও অমঙ্গল হইবে

না, সকল অমঙ্গল দূরীভূত করিয়া দিয়া জগতে আদর্শ স্থাপন করিবে।' সাবিত্রী মনে বল বাঁধিয়া সর্ব্বপ্রকারের ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। এমন কোন বার-ব্রত, উপবাস, পূজা-অর্চ্চনা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম রহিল না যাহা সাবিত্রী আপনি ঐকান্তিক চিত্তে গ্রহণ ও সম্পাদন করিতে বাকী রাখিলেন।

অনবরত এইরূপ কঠোর উপবাসে থাকিয়া ব্রত-পূজা সম্পন্ন করিতে করিতে সাবিত্রী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। কেবল প্রজ্জ্বলিত শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মত—তাঁহার ক্ষীণ শরীর বেড়িয়া উজ্জ্বলতর রূপের আগুন ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তপোবন-বাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কিন্তু শাশুড়ীর মনে বড় ভয় হইল। তাঁহার সেই অতি শীর্ণ দেহ কঠোর উপবাসের ভরে পাছে কোন দিন ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি বাধা দিবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু সাবিত্রী যখন জানাইলেন সে স্বামীর কল্যাণের জন্যই সে সকল অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন মায়ের প্রাণ আর তাহাতে বাধা দিতে পারিল না, তিনি দিবারাত্রি ইষ্টদেবতার কাছে কেবলই বধূর সুখ, স্বাস্থ্য ও আয়তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া করিয়া বৎসর কাটিতে চলিল—আর তিনটী দিন মাত্র বাকী! সাবিত্রী বহু কষ্টে শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর মত লইয়া 'ত্রিরাত্র ব্রত' আরম্ভ করিলেন।

ত্রিরাত্র ব্রত—অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার! তিন দিন-রাত্রি সমানভাবে অনশনে একাশনে বসিয়া এই কঠোর ব্রত সম্পন্ন করিতে হয়। উপবাসে উপবাসে সাবিত্রীর শরীর যেরূপ ক্ষীণ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার

এই ভয়ানক ত্রিরাত্র-ব্রত গ্রহণের জন্য শ্বশুর শাশুড়ী অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সভয়ে বলাবলি করিলেন—"সর্ব্বনেশে মেয়ে না জানি কখন কি ঘটাইয়া বসিবে!" কিন্তু সত্যবানের মঙ্গল কামনায় ব্রত করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা বধূকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তবুও সেই তিনটা দিন তাঁহাদের বড়ই ভয়ে ভয়ে কাটিল।

অবশেষে, ঐকান্তিক চিত্তে ব্রত সাঙ্গ করিয়া, সাবিত্রী, যখন হৃদয়ে বল বাঁধিয়া উঠিয়া আসিলেন—তখন সন্ধ্যা হইতে আর অল্পই বিলম্ব ছিল। সে দিন কৃষ্ণচতুর্দ্দশী—সত্যবানের মৃত্যুর দিন। সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সত্যবানকে বনে যাইতে উদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ এমন অসময়ে যাইতেছ কোথায়?" সত্যবান বলিলেন—"রাত্রে কুটীরে আগুন জ্বালিবার কাঠ নাই, তা ছাড়া ফল-মূলও ফুরাইয়াছে, তাই আনিতে যাইতেছি।"

"একটু দাঁড়াও, বাবা-মাকে প্রণাম করিয়া আসি, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

সত্যবান, সভয়ে চমকিয়া, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া, কহিলেন—"সে কি, তুমি যে এই তিন দিন-রাত মুখে জল পর্য্যন্ত দেও নাই। আগে গিয়া কিছু আহার কর। তোমার মুখ আজ বড় ভয়ানক দেখাইতেছে।"

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, আমি মরিব না। আর, যখন এ কয়দিন কাটিয়াছে, তখন এই রাতটাও কাটিয়া না গেলে খাইব না। কিন্তু তুমি আজ একা বনে যাইতে পারিবে না, আজ আমার ব্রতের উদ্‌যাপনের দিন—তোমার কাছ হইতে তফাতে থাকিতে নাই। বাবা মা'র অনুমতি লইয়া আসি, একটু দাঁড়াও।"

৬

সাবিত্রী গিয়া যখন শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে বনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তখন সহজে তা পাইলেন না। তাঁহার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া ভয়ে দুইজনারই বুক কাঁপিতেছিল, দুই জনেই প্রায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—

"অসম্ভব, তা কি হইতে পারে মা? আজ তিন দিন-রাত্রি কঠোর উপবাসে—একাসনে—সমান ভাবে বসিয়া এই মাত্র ব্রত সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া আসিতেছ! এখনও যে দেহ তোমার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, —এবারকার উপবাস তোমাকে ভয়ানক লাগিয়াছে, এখন তোমাকে সুস্থ না করিয়া আর আমাদের কাছ হইতে এক পা কোথাও নড়িতে দিব না।"

সাবিত্রী প্রমাদ গণিলেন, গুরুজনের অনুমতি না পাইলে তো কোন কার্য্যেই শুভ হইতে পারে না! তিনি নানা প্রকার শাস্ত্রের যুক্তি দিয়া শেষে কহিলেন—

"আজ আমার ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, আজ স্বামীর সঙ্গে যে একমুহূর্ত্তও ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিতে নাই। শাস্ত্রে বলে—"

সাবিত্রীর কথা শুনিয়া অন্ধ রাজর্ষি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"মা, শাস্ত্রের বিচারে তোমাকে আঁটিয়া উঠিবার জো নাই, বৃদ্ধ মুনি-ঋষিগণের চেয়েও ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যাপার তুমি বেশী জান। তোমার যখন অত ইচ্ছা হইয়াছে তুমি স্বচ্ছন্দে পতির সঙ্গে যাও, কিন্তু মা, এবার তুমি বড়ই কঠোর ব্রত

সাঙ্গ করিয়াছ, বনের ভিতর যাতায়াতের সুগম পথ নাই—এই দীর্ঘ উপবাসের পর—সে পথে চলিতে তোমার বড় কষ্ট হইবে। আগে কিছু খাইয়া—সুস্থ হইয়া গমন কর।"

সাবিত্রী আহ্লাদে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, শ্বশুর শাশুড়ীর পদধূলি মাথায় লইয়া বলিলেন—

"পতির সঙ্গে যাইতে উপবাসের কষ্ট আমাকে মোটেই লাগিবেনা, আপনারা দুঃখিত হইবেন না, আজ রাতটাও কাটিয়া না গেলে আমার খাইতে নাই।"

বলিয়া সাবিত্রী উৎসাহভরে সেখান হইতে বাহির হইলেন। তার পর মাণ্ডব্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের আশ্রমে আশ্রমে যাইয়া তাঁহাদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তপোবনের অন্যান্য মুনি-ঋষিরা সাবিত্রীর 'ত্রিরাত্র ব্রত' গ্রহণের ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, সকলেই ঐকান্তিক চিত্তে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"যাও মা, যম-জয়িনী হও।"

সাবিত্রীর মন আনন্দে ও উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। এই সব বাক্‌সিদ্ধ মুনি-ঋষিগণের কথা তো ব্যর্থ হইবার নহে! হৃদয়ে দশ গুণ বল লইয়া তিনি সত্যবানের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হাতের কুঠার ও রজ্জু প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "এইবারে চল—সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছে আর দেরী করা উচিত নয়।"

সেদিন সত্যবান পত্নীর মুখে কেমন যেন এক অভূতপূর্ব্ব অপার্থিব উজ্জ্বল জ্যোতির বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল—নিখিল বিশ্বের সমস্ত মহাশক্তি যেন সাবিত্রীর হৃদয়ে

পুঞ্জীভূত হইয়া মুখমণ্ডলে তাহারই আভাস জাগাইয়া তুলিয়াছে! মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার হাত ধরিয়া—আনন্দে এটা-ওটা দেখাইতে দেখাইতে বনের ভিতরে চলিলেন।

সন্ধ্যা হইল, নিকটবর্ত্তী বনের ভিতরে জ্বালাইবার উপযোগী কাঠ না পাইয়া তাঁহারাও ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর বনের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর বুকের ভিতরে ঝড় বহিতেছিল! কিন্তু পাছে সত্যবান তাহা জানিতে পারেন, সেই ভয়ে নানা কথায় ভুলাইয়া চলিতে লাগিলেন, তবুও তাঁহার স্থির দৃষ্টি রহিল পতির মুখের উপরে।

সাবিত্রীর আশ্চর্য্য রূপের জ্যোতিতে সেই কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর অন্ধকারেও সত্যবানের যেমন পথ দেখিয়া লইতে কষ্ট হইল না, সাবিত্রী ও তেমনি পতির মুখ সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন—রাত্রি যতই বাড়িতেছে—সত্যবানের মুখের ভাবও ততই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে! তিনি বুঝিলেন যে, সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে! তাঁহার বক্ষস্থল আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু তবুও ক্ষুদ্র রমণীর মত ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। নারদের আশীর্ব্বাদ এবং অন্যান্য মুনিগণের "যম জয়িনী হও" আশির্ব্বাণী মনে পড়িল, দৃঢ় বলে বুক বাঁধিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর কাটিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সত্যবানের মুখেও যেন একখানি কাল ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিল। সেই সময়ে একটা গাছে ছেদনের উপযোগী কাঠ দেখিয়া সত্যবান কুঠার লইয়া তাহাতে আরোহন করিলেন। সাবিত্রী কম্পিত বক্ষে—স্থির দৃষ্টিতে—তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

৮

হায়, হায়, সবিত্রী তবুও—ঠিক তেমনিভাবে—তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এবার যমরাজ দু'চোখ কপালে তুলিয়া একেবারে হতভম্বের মত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন! কেমন করিয়া যে সাবিত্রীর হাত ছাড়াইবেন ভাবিয়া পাইলেন না! ভয়ে ও বিস্ময়ে ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—

"সাবিত্রী উপর্য্যুপরি তোমাকে চারটি বর দিলাম, তবুও সঙ্গে আসিতেছ কেন মা? এইবারে আমাকে রক্ষা কর, অব্যাহতি দাও। নহিলে যে যাইতে পারিতেছিনা মা?"

এবার মৃদু হাসিয়া সাবিত্রী কহিলেন—"আপনি যে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, অধর্ম্ম করিয়া তো পলাইতে পারেন না—তাই নিজেই যে যাইতে পারিতে-ছেন না প্রভু! আমাকে স্বামীর ঔরসজাত শত পুত্রের বর দিয়াছেন, সুতরাং আমার স্বামীকে লইয়া যাইবেন কেমন করিয়া?"

যমরাজ ক্ষণকালের জন্য একেবারে বাক্‌শক্তি বিরহিত হইয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর সাবিত্রীর হস্তে সত্যবানের মহাপ্রাণটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

"যাও মা—এই লও তোমার পতির প্রাণ! তোমার মত সাধ্বী পতিব্রতার কাছে পরাজিত হইয়া আজ গর্ব্বে আমার বুক ফুলিয়া উঠিতেছে! আশীর্ব্বাদ করি তোমার নাম—অমর হউক, তোমার আদর্শের পূজা জগতের ঘরে ঘরে হোক্! পতিপুত্র লইয়া—মনের সুখে রাজ্য সম্পদ ভোগ কর।"

যমও বিদায় হইলেন, সাবিত্রীরও যেন ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া

দেখিলেন—সেই অরণ্যের সেই গাছতলায়—তেমনি সত্যবানকে কোলে লইয়া তিনি বসিয়া রহিয়াছেন! চোখ মুছিয়া চাহিতেই দেখিলেন—সত্যবান আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া, যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন।

এদিকে, কুটীরে সহসা অন্ধ রাজর্ষি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন। রাত্রি শেষ হইতে চলিয়াছে—তবুও সাবিত্রী সত্যবান বন হইতে ফিরেন নাই দেখিয়া পতিপত্নী উভয়েরই বিষম চিন্তা হইল, আকুলভাবে ছুটিয়া বাহির হইলেন এবং অন্যান্য মুনিগণের আশ্রমে আশ্রমে গিয়া সেই ভয়ের কথা জানাইলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া সাবিত্রী সত্য-বানের অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু অধিকদূর তাঁহাদিগকে যাইতে হইল না। প্রথম উষার সঙ্গে সঙ্গে দশগুণ রূপের জ্যোতি ছড়াইয়া সাবিত্রী সত্যবান ফিরিয়া আসিয়া সকলের পদবন্দনা করিলেন। তারপর সকলে যখন সে রাত্রের বিবরণ শুনিলেন, তখন সাবিত্রীকে দেবতারই মত সম্মান করিয়া 'ধন্য ধন্য' রব তুলিলেন।

যথাকালে দ্যুমৎসেন হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন, অশ্বপতিরও শত পুত্র হইল। সাবিত্রীর জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল।



দময়ন্তী।

১

তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব নীল আকাশের গায়ে সিন্দুর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার রক্তাভা নীল আকাশ-সমুদ্রকে যেমন রঞ্জিত করিয়াছিল, তেমনি বায়ুমণ্ডলে সেই আভা ছড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র পৃথিবীর বুকে যেন রক্তস্রোত বহাইতে ছিল।

বিদর্ভরাজের পুরোদ্যানে সেই শোভা পূর্ণ মাত্রাতেই বিরাজ করিতে ছিল। উদ্যান মধ্যস্থ সরোবরে উপরিস্থিত আকাশ মণ্ডলের আভা প্রতি-ফলিত হইয়া—মুকুরে সূর্য্যরশ্মি পাতের ন্যায়—চতুর্দ্দিকে রক্ত হিল্লোল বহিয়া ছিল, আর সেই রক্ত হিল্লোল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ষোড়সী বিদর্ভ-বালা দয়মন্তী সহচরীগণ সহ উদ্যান ভ্রমণ করিতেছিলেন।

বিদর্ভরাজ ভীমসেনের আদরিণী নন্দিনী—'দময়ন্তী।" সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তাঁহার রূপগুণের খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ রূপ এবং গুণ উভয়েই তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় রমণী আর তৎকালে ভারতবর্ষে ছিল না। ভারতের বহু রাজন্যবর্গ দময়ন্তী লাভাশায় ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

একটি প্রস্ফুটিত মালতী কুঞ্জের দ্বারে দময়ন্তী বসিয়াছিলেন, সখীরা পুষ্পাভরণে তাঁহাকে বনদেবী সাজাইতে ছিল। সহসা একটি স্বর্ণবর্ণ রাজহংস উড়িয়া আসিয়া সরোবরে পড়িল। এরূপ অপূর্ব্ব স্বর্ণ পক্ষ মরাল দর্শনে সকলেই অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া, তাহাকে ধরিতে ছুটিল,

কিন্তু পারিল না। হংস সরসীর মধ্যস্থলে গ্রীবা হেলাইয়া দময়ন্তীর দিকে চাহিতে লাগিল।

দময়ন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে, জলের নিকটে গিয়া, তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। সে দিকে তিনি একাকী ছিলেন। তাঁহার ডাক শুনিয়া স্বর্ণ হাঁস ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিল। তিনি তাহাকে ধরিলে, হাঁস, নিষধরাজ 'নলের' রূপগুণের বিষয় বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত দময়ন্তীকে অনুরোধ করিলেন।

দময়ন্তী ইতিপূর্ব্বেও—নলরাজের রূপগুণের কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে হংসমুখে তাহা পুনরায় অবগত হইয়া—মনে মনে—নলকেই পতিত্ব বরণ করিলেন, এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ—নলরাজকে দিবার জন্য—স্বীয় অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া হংসকে প্রদান করিলেন।

দৃঢ় ওষ্ঠে অঙ্গুরীয় লইয়া স্বর্ণ মরাল উড়িয়া গেল।

২

রাজ্যেরপ্রান্তে বনভাগে নিষধরাজ নল মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। রাজহংস সেইখানে গিয়া দময়ন্তীর হাতের আংটী দিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ জানাইয়া উড়িয়া গেল। রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে যথাকালে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া হৃষ্টচিত্তে বিদর্ভরাজ্যে গমন করিলেন।

স্বয়ম্বরের পূর্ব্বদিনে নলরাজ রাজ্য প্রান্তে ভ্রমণ করিতেছিলেন—সহসা ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ভাগ্য মানিয়া, পুণ্যবান নলরাজা তাঁহাদের আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিন্তু দেবগণ যখন তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, তখন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা দময়ন্তী লাভের আশায় মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কাহাকেও বরমাল্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে নলরাজকে দূতরূপে দময়ন্তীর কাছে যাইতে কহিলেন।

দেবতাদের মুখে এইরূপ অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া নলের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায় হায়—দময়ন্তী যে তাঁহারই অনুরক্তা; তিনি যে হংসমুখে বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার পাণি গ্রহণের জন্যই এখানে আসিয়াছেন। নলের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এরূপ অসম্ভব কার্য্য তিনি কিরূপে সম্পন্ন করিবেন?

কিন্তু দেবতারাও নাছোড়। অগত্যা মহানুভব নল, পরের সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে কৃত সংকল্প হইয়া দেবদূত রূপে দময়ন্তী নিকটে

গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেব মায়ার প্রভাবে তিনি সকলের অদৃশ্য হইয়া গমন করিলেন—অন্য কেহ জানিতে পারিল না।

কিন্তু দময়ন্তী দেবদূতের সে অনুরোধে কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। তিনি নলকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, নলরাজই তাঁহার স্বামী। স্বামী হইয়া আজ পত্নীকে কেন তিনি এরূপ অন্যায় আদেশ করিতেছেন? রাজকুমারীর ফুল্ল গণ্ডযুগল অশ্রু প্লাবিত হইল। তিনি দেবগণকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া দূতবরকে বিদায় দিলেন।

নলরাজের অন্তর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু দেবতাদের আচরণে মনে মনে বড় শঙ্কিত হইলেন।

৩

ক্রুদ্ধ দেবগণ দময়ন্তীকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে, আপনারা নলের রূপ পরিগ্রহণ করিয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। একসঙ্গে এতগুলি নলরাজাকে দেখিয়া সভাশুদ্ধ সকলেই চমৎকৃত হইল। দেবমায়া বুঝিয়া সকলেই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল।

দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করিয়াই সেই ব্যাপার দেখিয়া, দেবতাদের ছলনা বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন সর্ব্ব সমক্ষে, করযোড়ে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"সভাস্থ সকলে শুনুন—আমি নিষধপতি নলরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি—নলরাজই আমার স্বামী। হে অন্তর্য্যামী দেবগণ, আপনারা আমার পিতা। পিতা হইয়া কন্যাকে অধর্ম্মাচারী করিবেন না, নন্দিনীর পাতিব্রত্য ধর্ম্মে আঘাত করিবেন না। আমি, আমার স্বামী নলরাজকে চিনিতে পারিতেছি না, আপনারা ছলনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করুন, কাতরা কন্যাকে পতিকরে অর্পণ করুন। পিতা হইয়া তনয়ার ধর্ম্মরক্ষা করুন।"

দেবগণ, সতীর সেই সকাতর মিনতি দর্শনে, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আপনাপন রূপ ধারণ করিলেন। হৃষ্টমনে সাধ্বী দময়ন্তী নলরাজকে বরমাল্য প্রদান করিলেন। দেবগণও দময়ন্তীর পাতিব্রত্যে এবং নলের মহানুভবতায় সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যেকে তাঁহাকে এক একটি বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কেহ বর দিলেন—'নলরাজ বিনা অগ্নিতে রন্ধন করিতে পারিবেন—

যে কোন বস্তুতে ফুৎকার মাত্রেই অগ্নি প্রজ্জলিত হইবে।' কেহ বর দিলেন—'তিনি যথায় তথায় জল পাইবেন—শূন্যকুম্ভে, দৃষ্টি মাত্রেই তাহা জলে পূর্ণ হইবে।' কেহ বর দিলেন—"তিনি ইচ্ছা মাত্রেই, প্রাণী বশ করিতে পারিবেন এবং ধর্ম্মে তাঁহার অবিচল মতি থাকিবে।"

দেবগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন ;—ক্রুদ্ধ রহিল কেবল কলি ও তাহার সখা দ্বাপর। দেবগণ যেখানে পাণিপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন—সেখানে—তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া—দময়ন্তী, নলরাজকে বরণ করিল! তাহাদের অন্তরে আগুন জ্বলিল। ক্ষুদ্র নারীর এতদুর স্পর্দ্ধা ?—ভাল, কি করিয়া সে নলকে রক্ষা করে, এবং নলই বা কেমন করিয়া ভার্য্যাকে সুখী করেন—তাহারা দেখিয়া লইবে।

৪

বিবাহের পরে কিছুকাল রাজারাণী পরম সুখে কালযাপন করিলেন। তাঁহাদের একটি পুত্র ও এক কন্যা হইল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে—তাই বুঝি পরম ধার্ম্মিক রাজ-দম্পতীরও অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল।

একদিন বন ভ্রমণ কালে নলরাজা মূত্রত্যাগের পরে পদ প্রক্ষালন করিতে বিস্মৃত হইলেন। কলি এতদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল,—পায় নাই। সে সহসা আজ এই অচিন্তিত সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অশুচি নলরাজের দেহে আশ্রয় করিল। তখন আর তাহাকে পায় কে?

নলের এক সহোদর ছিল—পুষ্কর। সে অতি হীনচেতা—পরশ্রীকাতর—স্বার্থপর—অধার্ম্মিক। কলি তাহাকে রাজ্যলোভ দেখাইয়া আপনার ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া লইল। তারপর দ্বাপরাশ্রিত পাশা দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় নলকে বারম্বার পরাভূত করাইয়া, পুষ্করকে তাঁহার ধন সম্পদ রাজ্যাদি জিতাইয়া দিল। কপর্দ্দকহীন নল পাশায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া—দীনের দীন, হীনের হীন হইয়া—একবস্ত্রে বনগমন করিলেন। পতিব্রতা সাধ্বী দময়ন্তী—পতিকে ত্যাগ করিয়া, অমরার ঐশ্বর্য্যলাভেও ঘৃণা করেন। তিনিও পতিসেবার্থে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক বস্ত্রে পতির সঙ্গে গমন করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজারাণীর আদেশে তাঁহাদের পুত্রকন্যাকে কৌণ্ডিল্য নগরে তাঁহাদের আত্মীয়ের নিকট রাখিয়া আসিলেন।

পুষ্কর রাজা হইল—কলি তাহার মন্ত্রী। সে রাজ্যময় ঘোষণা করিল—যে ভূতপূর্ব্ব রাজারাণীকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রামের স্থান দিবে, অথবা পিপাসার জল দিবে, বা বস্ত্র ও খাদ্যাদি দিবে—তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

পতিব্রতা রমণীর—যেখানে স্বামী,—সেইখানেই রাজ্য, সেইখানেই স্বর্গসুখ। স্বামীসেবাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্ম্ম—একমাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র ব্রত। তাই দময়ন্তী—দুর্দ্দশাগ্রস্ত, রাজ্যাপহৃত স্বামীর সেবার জন্য—তাঁহার সমুদয় স্ত্রীধন বর্জ্জন করিয়া এক বস্ত্রে, স্বামীর সঙ্গে চলিলেন।

নলরাজা বড় চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলেন। যত দুঃখ, যত কষ্ট, যত বিপদ হোক—তাঁহার উপর দিয়া যত ঝড় বহিয়া যাউক—তিনি অকাতরে সকল সহিবেন। কিন্তু এ দশায় তাঁহার প্রতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীকে কিরূপে সঙ্গে লইবেন?—এযে অসম্ভব কথা, তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। কিন্তু হরি—হরি!—দময়ন্তী কিছুতেই শুনিলেন না।

ক্রমান্বয়ে তিন দিন বনে বনে অনাহারে ঘুরিয়া রাজারাণী অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা দময়ন্তীর ফুল্ল কমল বদন শুষ্ক হইল—নলরাজ হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য তিনি দময়ন্তীকে বারম্বার কতরূপে বুঝাইতে লাগিলেন—দময়ন্তী বুঝিলেন না। তখন নলরাজ মনে মনে অন্য মতলব স্থির করিতে লাগিলেন।

অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া উভয়ে যখন এক ক্ষুদ্রকায়া তটিনী হইতে অঞ্জলি করিয়া জলপান করিতেছিলেন—তখন সহসা নলরাজা দেখিতে পাইলেন—এক বৃক্ষশাখায় একটি স্বর্ণবর্ণ সুন্দর বিহঙ্গম বসিয়া রহিয়াছে। উঃ, আজ তিন দিন তাঁহারা উপবাসী। পাখীটি ধরিয়া নগরে গিয়া বিক্রয় করিলেও অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। নল পক্ষী ধরিতে চলিলেন।

আপনার একমাত্র বস্ত্রাঞ্চল যেমন পক্ষীঅঙ্গে চাপা দিয়া ধরিবেন,—নলের মনে হইল—সহসা পক্ষী যেন সজোরে তাঁহার সমস্ত বস্ত্রখানি ছিনাইয়া লইয়া শূন্যে উড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলিল—"ইহাও কলির ছল জানিও, দেববাঞ্ছিত রমণী লাভ করিয়াছ—তাহার ফলভোগ কর!"

একমাত্র বস্ত্র ছিল—তাহাও গেল;—নলরাজ বিবস্ত্র—নগ্ন। সাধ্বী সহধর্ম্মিনী তৎক্ষণাৎ নিজের বসনের অর্দ্ধভাগ স্বামীকে পরাইয়া বাকী অর্দ্ধেকে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করিলেন।

৬

কিন্তু আর এরূপে চলে না। দুইজনে একমাত্র বস্ত্রে, অনাহারে, বনে বনে এমন করিয়া আর কতদিন কাটাইবেন? দময়ন্তীকে বুঝাইয়া বলিলেও বুঝিবে না। কিন্তু নল তাঁহার অজ্ঞাতে পলাইলে—তাঁহাকে না পাইয়া—দময়ন্তীকে বাধ্য হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পতিপ্রাণা সাধ্বীকে তাহা হইলে আর এত কষ্ট সহিতে হইবে না। নলরাজা মতলব স্থির করিয়া ফেলিলেন।

নানা কথাচ্ছলে দুই-তিন দিন ধরিয়া নলরাজা দময়ন্তীকে "বিদর্ভ" গমনের পথ চিনাইয়া দিলেন। দময়ন্তী তাঁহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে সহসা একদিন সুযোগক্রমে—দময়ন্তীর নিদ্রিত অবস্থায়—বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন করিয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা পলাইলেন।

পতিব্রতা রাজরাণী এইবারে যথার্থ ই অভাগিনী হইলেন। নলরাজের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই জাগরিতা হইয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ধাবিতা হইলেন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কত ডাকিলেন—হায় তাঁহার ডাক আর কে শুনিবে? অভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে তিনি প্রকৃতই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। দুই চক্ষে যাহা দেখিতে লাগিলেন সকলকেই স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তরু, গুল্ম, লতা, নদী, পাহাড়, ঝরণা, পশু পক্ষী সকলের নিকট, হৃদয়ভেদী করুণস্বরে স্বামীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উন্মাদিনী বন হইতে বনান্তরে ধাবিতা হইলেন। তাঁহার হৃদয়ভেদী বিলাপে বনস্থলী

ম্রিয়মাণ হইল—পশু পক্ষী নীরব হইল, বায়ুও পত্রান্তরালে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সহসা এক ভীষণ অজগর বিলাপ ধ্বনিতে জাগরিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া দময়ন্তীকে গ্রাস করিতে ছুটিল। উন্মাদিনী সকাতরে নলরাজকে ডাকিতে লাগিলেন। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে নিক্ষিপ্ত একটি তীক্ষ্ণ বাণ সাপটাকে খণ্ড খণ্ড করিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই কয়জন কিরাত আসিয়া দময়ন্তীকে বেষ্টন করিল। তাহারা বনে শীকার করিয়া বেড়াইতেছিল।

অসামান্য রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ব্যাধেরা দময়ন্তীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তাঁহার প্রদীপ্ত সতীত্ব-তেজে সকলেই আপনাদের চতুর্দ্দিকে অগ্নির উত্তাপ অনুভব করিয়া ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। অনাহারী পথ ক্লিষ্টা সতী আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন।

তখন এক সিদ্ধ-যোগীপুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে গমনের জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণে আবার আশা জাগিল।

সেই সময়ে সেই বন প্রান্ত দিয়া একদল বনিক পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে যাইতেছিল। তিনি তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকিলেও—নির্ব্বাপিত হয় না। দময়ন্তীর রূক্ষকেশ—ছিন্ন মলিন বেশ এবং সর্ব্বাঙ্গ ধূলি কর্দ্দমে অভিষিক্ত হইলেও—তাহার মধ্যদিয়া অপূর্ব্ব রূপভাতি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। রূপমুগ্ধ বণিকদল তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় রহিল। কিন্তু সতীর সহায়—ভগবান! সহসা এক মত্তমাতঙ্গ উপস্থিত হইয়া বনিকদলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল—দময়ন্তী পলাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে—চেদী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চেদীরাজমাতা প্রাসাদ ছাদে বেড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন—রাজপথে এক অপূর্ব্ব রূপসী পাগলিনী বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার অন্তর দয়ায় গলিয়া গেল। তিনি ধাত্রী দ্বারা দময়ন্তীকে পূরে আনাইয়া সকল শুনিলেন। এবং নানা মিষ্ট কথায় আশা দানে তাঁহাকে আপনার নিকটে যত্নে রাখিলেন। তাঁহার কন্যা সুনন্দা দময়ন্তীকে ভগ্নীর ন্যায় আদর যত্ন করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী রাজমাতার ভগ্নী-কন্যা,—কিন্তু তখন কেহ কাহারও পরিচয় পাইলেন না।

৭

এদিকে পলায়িত ছন্নমতি নলও ক্ষিপ্তের ন্যায় বন হইতে বনান্তরে ছুটিতে লাগিলেন—পাছে দময়ন্তী আসিয়া ধরে! নিদ্রাবস্থায় অর্দ্ধবাসে সুশীলা ধর্ম্মপত্নীকে ভীষণ অরণ্যে একা ফেলিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু উপায় নাই—তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া পতিপ্রাণা কত কষ্ট সহ্য করিবে? এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই বিদর্ভে পিতৃসকাশে গমন করিবেন,—নলরাজ কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

সহসা একদিন সেই বনে দাবানলের উৎপত্তি হইল—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। কর্কট নাগ প্রাণের দায়ে উচ্চ চীৎকার করিতেছিল,—সে করুণস্বর নলের কর্ণে গেল। তিনি ত্বরিতে গিয়া অগ্নিমধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। সে কিন্তু এই উপকারের পরিবর্ত্তে, তদ্দণ্ডেই নলরাজাকে দংশন করিল, এবং দেখিতে দেখিতে নলের স্বর্ণকান্তি, দগ্ধীভূত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বিকৃত কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়া গেল।

ধিক্কার দিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কর্কট কহিল—"আমি আপনার মঙ্গলই করিয়াছি। এই দারুণ দুঃসময়ে স্বর্ণকান্তির কোন প্রয়োজন নাই। ঐরূপ কান্তি বরং বিপত্তির কারণ হইতে পারে। এই কৃষ্ণবর্ণ ই এখনকার উপযুক্ত,—কেহই আর নলরাজা বলিয়া চিনিতে পারিবে না, স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জনের একটা উপায় করিয়া লইতে পারিবেন। আর আমার বিষে আপনার কিছুই হইবে না বরং আপনার দেহাশ্রিত কলিই পুড়িয়া দগ্ধ হইবে। আপনি ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে গমন করুন। আপনার

অদ্ভূত 'অশ্ববিদ্যা' তাঁহাকে দিয়া তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য 'গণনা-বিদ্যা' গ্রহণ করিবেন। তদ্দ্বারা কলিকে জয় করিতে পারিবেন। আমাকে স্মরণমাত্রেই আবার পূর্ব্বকান্তি প্রাপ্ত হইবেন।" সর্পরাজ নলরাজকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া চলিয়া গেল।

নলরাজ অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে গিয়া 'সারথি' রূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৮

ওদিকে কন্যাজামাতার আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিদর্ভরাজ, তাঁহাদের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ, কেহ বা গণক সাজিয়া, কেহ বা সন্ন্যাসী রূপে, কেহ বা অন্যপ্রকার ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। তন্মধ্যস্থ একজন 'দময়ন্তীর' সন্ধান পাইয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। ভীমসেন অতি যত্নে কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

কিন্তু নলরাজের কোন সন্ধান মিলিল না। পতিপ্রাণা দময়ন্তী পিতৃবাসে থাকিয়াও, একবস্ত্রে, মুক্ত রুক্ষকেশে তপশ্চারিণী হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে বাঁচিবার লক্ষণ আর দৃষ্ট হইল না। কোনমতে আশায় আশায় দিন কাটাইতে লাগিলেন।

অযোধ্যা হইতে একজন ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইল। সে, ঋতুপর্ণ রাজার সারথি 'বাহুকের' নানা আশ্চর্য্য গুণাবলীর কথা ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু সে অতি কদাকার—কখনই নলরাজা নহেন।

'বাহুকের' কথা শ্রবণাবধি দময়ন্তীর হৃদয়মধ্যে কেমন আকস্মিক আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহার বামঅঙ্গ স্পন্দিত হইতে লাগিল; প্রাণে, সুপ্ত আশা যেন নবভাবে জাগিয়া উঠিল। তিনি গোপনে মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া—পিতার অগোচরে—পিতৃনামে এক নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া ঋতুপর্ণের নিকটে পুনরায় এক দূত পাঠাইলেন।

যেদিন দূতের অযোধ্যায় গিয়া পৌছান সম্ভবপর, হিসাব করিয়া দময়ন্তী সেই দিন স্থির করিলেন। ঠিক তাহার পরদিনেই 'দয়মন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর হইবে'—পত্রে ঋতুপর্ণকে তাহারই নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

———



৯

ঋতুপর্ণ, বাহুককে জিজ্ঞাসা করিলে, বাহুক কহিলেন—"মহারাজ গুরুর কৃপায় আমি তড়িৎ গমনে অশ্বচালনায় সক্ষম—কালি প্রভাতের পূর্ব্বেই বিদর্ভে পৌঁছাইয়া দিব।" ঋতুপর্ণ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

দময়ন্তীর মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তথাপি প্রিয়সখী সুনন্দাকে পাঠাইয়া বিবিধ বিধানে পরীক্ষা করিলেন। দময়ন্তীর দুঃখ-কাহিনী শ্রবণে ছদ্মবেশী নলের হৃদয় করুণায় ও দুঃখে আর্দ্র হইয়া উঠিল—গোপনে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না—সখীরা দেখিল। তাহারা এবং স্বয়ং দময়ন্তীও অন্তরালে থাকিয়া আরও দেখিলেন যে, শূন্যকুম্ভ বাহুকের দৃষ্টিমাত্রেই বারি পূর্ণ হইল, ফুৎকার মাত্রেই কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিল। আর সন্দেহের কারণ কি!

এদিকে উভয় রাজাই পরস্পর বাক্যালাপে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তখন বিদর্ভরাজ অন্দর হইতে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া অযোধ্যাধিপতিকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে খুব আমোদের উচ্চহাস্য উঠিল, তাঁহারাও বাহুকের পরীক্ষায় যোগ দিলেন।

ঋতুপর্ণ বাহুকের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া আপন গণনা-বিদ্যা প্রদান করিলেন। তখন পরাভূত কলি, কম্পান্বিত কলেবরে আসিয়া নলরাজের নিকটে আপন কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল। আকাশ হইতে দৈববাণী ও পুষ্পবৃষ্টি হইল। কর্কট স্মরণে নলের পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিল। বহু দিনান্তে পতিপত্নীর পুনর্ম্মিলনে বিদর্ভ স্বর্গরাজ্যের ন্যায় পরমানন্দময় হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ।

"গাঙ্গুলী-প্রেস"
প্রিণ্টার—শ্রীশ্যামাপদ গাঙ্গুলি
২৭নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।